গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭০ বর্ষ ৪৮ সংখ্যা | ২০ - ২৬ জুলাই ২০১৮ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | www.ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ২ টাকা

হায়ার এডুকেশন কাউন্সিল গঠনের স্বৈরাচারী সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করলেন কমরেড প্রভাস ঘোষ

ইউজিসি বাতিল করে হায়ার এডুকেশন কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া গঠন করার জন্য কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী খসড়া আইন রচনা করে সকলের মতামত চেয়েছেন। তার ভিত্তিতে এসইউসিআই(সি) সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ তাঁর সুচিন্তিত বক্তব্য পাঠিয়েছেন।

কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেছেন, সংসদীয় আইনের বলে ১৯৫৬ সালে স্বশাসিত সংস্থা হিসাবে গঠিত হয়েছিল ইউজিসি। দেশের উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণার মান নির্ধারণ, নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন, আর্থিক অনুদান প্রদান প্রভৃতি দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল তার উপর। সুদীর্ঘ ৫২ বছরের ঐতিহ্যসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান ইউজিসি-কে অবলুপ্ত করে হায়ার এডুকেশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া গঠন করার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকার কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় সহ সমগ্র উচ্চ শিক্ষার উপর আরও নিয়ন্ত্রণ কায়েম করতে চাইছে। শিক্ষার সংকোচন, বেসরকারিকরণ, বাণিজ্যিকীকরণ ও বিশেষ করে সাম্প্রতিক কালে শিক্ষার গৈরিকীকরণের উদ্দেশ্যে ক্রমাগত সরকারি হস্তক্ষেপের মাধ্যমে ইউজিসি-কে বাস্তবে কেন্দ্রীয় সরকারের দপ্তরে পরিণত করা হয়েছে ঠিকই। কিন্তু তার পরিবর্তে নতুন আইনের মাধ্যমে যে শিক্ষা কমিশন গঠিত করার ব্যবস্থা চলছে সেই কমিশনের স্বাধীনভাবে কাজ করার কোনও অধিকার থাকবে না। কারণ এই নতুন আইনের বলে কেন্দ্রীয় সরকার কমিশনের সদস্য মনোনয়ন করবে শিক্ষাবিদদের পরিবর্তে মূলত ব্যুরোক্র্যাটদের মধ্য থেকে। তার উপর চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান সহ সকল সদস্যকে পদচ্যুত করারও অধিকার থাকবে সরকারের হাতে যদি তাঁদের কাজ সরকারের অপছন্দ হয়। অথচ চলতি আইন কেন্দ্রীয় সরকারকে তেমন ক্ষমতা দেয়নি।

উপরন্তু, এই আইনের ধারা অনুযায়ী কমিশনের একটি 'উপদেষ্টা সংস্থা' থাকবে, যা বর্তমান ইউজিসিতে নেই এবং যার চেয়ারম্যান হবেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী নিজে। অর্থাৎ সমস্ত দিক দিয়ে এই কমিশন হবে কেন্দ্রীয় সরকারের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রাধীন।

এই কমিশনের হাতে নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনুমোদন দেওয়া, শিক্ষা ও গবেষণার মান যাচাই করা প্রভৃতি থাকলেও আর্থিক অনুদান প্রদানের কোনও ক্ষমতা থাকবে না— যা বর্তাবে সরকারের উপর। ফলে আর্থিক অনুদান প্রদানের ক্ষেত্রে সরকার তথা শাসক দলের ইচ্ছা-অনিচ্ছাই প্রাধান্য পাবে। উপরন্তু, এই নতুন আইনের বলে সরকার মানের নিম্নতার অজুহাতে যেকোনও বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দিতে পারবে। ফলে এই আইনে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কেন্দ্রীয় সরকারের নাক গলানোর অফুরন্ত সুযোগ থাকবে। এর ফলে এই কমিশন কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষানীতি যা বর্তমানে সম্পূর্ণভাবে শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্যের পরিপন্থী তাকেই কার্যকরী করবে।

এই পরিস্থিতিতে আমাদের দাবি— ইউ জি সি বাতিলের খসড়া আইন অবিলম্বে প্রত্যাহৃত হোক এবং শিক্ষক ও ছাত্র সংগঠন এবং শিক্ষাবিদ সহ অন্যান্যদের মতামত নিয়ে এমন একটা আবহ সৃষ্টি করা হোক যাতে ইউজিসি সমাজের পিছিয়ে পড়া ও আর্থিকভাবে দুর্বল সকল পরিবারের জন্য ধর্মনিরপেক্ষ, বৈজ্ঞানিক ও গণতান্ত্রিক শিক্ষা প্রসারে দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারে।

কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা, পৃষ্ঠা ঃ ৩

প্রথম শ্রেণি থেকেই পাশ-ফেল

দাবি না মেটা পর্যন্ত আন্দোলন চলবে

কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী প্রকাশ জাভড়েকরের ঘোষণা অনুযায়ী এবারের বাদল অধিবেশনেই পাশ-ফেল ফেরানোর জন্য শিক্ষা আইনের সংশোধনী সংসদে পেশ হওয়ার কথা। এই সংশোধনী পেশ হলে তার অর্থ হবে, পাশ-ফেল তুলে দেওয়ার নীতি যে ভুল ছিল, সরকারের তরফে তা মেনে নেওয়া। কেন্দ্রীয় সরকারের এই বিলম্বিত 'বোধোদয়' স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঘটেনি, ঘটেছে দীর্ঘ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে।

২০০৯ সালে শিক্ষা অধিকার আইনের নামে কেন্দ্রের তৎকালীন কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউ পি এ সরকার অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাশ-ফেল তুলে দেয়। পরবর্তী সময়ে কেন্দ্রে ও রাজ্যে সরকার পাল্টালেও প্রত্যেকেই এই জনবিরোধী নীতি বহাল রাখে।

পাশ-ফেল বিসর্জন নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরুর প্রথম দিকে আমরা এর অনিবার্য পরিণামের দিকগুলি বার বার তুলে ধরেছি। আজ এর প্রতিটি সত্যে পরিণত। বিগত কয়েক বছর সরকার নিযুক্ত নানা কমিটি বা কমিশনও তাদের রিপোর্টে সুস্পষ্ট

দুয়ের পাতায় দেখুন

বাদাম পুড়িয়ে এগরায় কৃষক বিক্ষোভ

চিনাবাদাম ও কাঁচা লঙ্কার লাভজনক দামের দাবিতে এগরায় কৃষক বিক্ষোভ। ১৩ জুলাই। সংবাদ পাঁচের পাতায়।

ঠিকানা খোলা মাঠ, তবু 'শ্রেষ্ঠ' জিও বিশ্ববিদ্যালয়

জিও বিশ্ববিদ্যালয় নাকি দেশের শ্রেষ্ঠ ৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একটি! ছা-পোষা 'হরিপদ কেরানি'দের কথা ছেড়ে দিন, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার সাথে যুক্ত তাবড় শিক্ষাবিদদের কাছেও কি এমন তথ্য ছিল কোনও দিন!

কোথায় সেটি? জানা গেছে নবি মুম্বইয়ের কাছে একটি খোলা মাঠই নাকি সেই উৎকৃষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বর্তমান রূপ, আগামী তিন বছরে বিল্ডিং হিসাবে যার রূপান্তর ঘটবে! আপাতত বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পদ হল লকলকে সবুজ ঘাস আর চোরকাঁটার কিছু ঝোপ। ক্লাসঘর, ল্যাবরেটরি, লাইব্রেরি এসব কোনও কিছুরই যে অস্তিত্ব নেই! না থাক, তবু তার উদ্যোক্তার নাম মুকেশ আম্বানি এবং নিতা আম্বানি— রিলায়েন্স কোম্পানির মালিক। এঁদের প্রসাদে চার্টার্ড প্লেন চড়ে দলের প্রচার করে বেড়ান নরেন্দ্র মোদি-অমিত শাহরা। বিজেপির ভোট বৈতরণীর কড়ি যাঁদের টাকার থলি থেকে আসে, তাঁদের না-জন্মানো বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতশ্রেষ্ঠ মান শুধু মাঠের ঘাস দেখেই কেন্দ্রীয় 'এক্সপার্ট' কমিটি যদি বুঝেই না ফেলল, তবে তাদের আর সরকারি মাইনে দিয়ে রাখা কেন?

ঘটনা হল, কেন্দ্রীয় সরকারের মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক প্রাক্তন নির্বাচন কমিশনার এন গোপালস্বামীর নেতৃত্বে একটি এক্সপার্ট কমিটিকে দায়িত্ব দিয়েছিল দেশের মধ্যে কিছু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে

ছয়ের পাতায় দেখুন

জনস্বাস্থ্যকে অবহেলা করছে বিজেপি সরকার

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রকের তত্ত্বাবধানে তৈরি ন্যাশনাল হেলথ প্রোফাইলের প্রকাশিত একটি রিপোর্ট দেখে দেশবাসীর ভিরমি খাওয়ার উপক্রম। গত ১৯ জুন বিজেপির কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জে পি নাড্ডা রিপোর্ট পেশ করতে গিয়ে বলেছেন, ১৩০ কোটি ভারতবাসীর জন্য রয়েছেন ১০ লক্ষ অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসক, অর্থাৎ প্রতি ১১,০৮২ জন রোগীর জন্য এক জন চিকিৎসক। দাঁতের চিকিৎসার চিত্রটা আরও ভয়াবহ। ১,৭৬,০০৪ জনের জন্য একজন দন্ত চিকিৎসক। ৫৫, ৫৯১ জন ভারতীয়ের জন্য বরাদ্দ একটি সরকারি হাসপাতাল, ১, ৮৪৪ জন পিছু বরাদ্দ সরকারি হাসপাতালের একটি মাত্র বেড (এই সময়, ২৪.০৬.'১৮)।

ভারতে এক-তৃতীয়াংশ শিশু জন্মগ্রহণ করে কম ওজন নিয়ে। ফিরে আসছে ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু, চিকুনগুনিয়া কালাজ্বরের মতো মারাত্মক রোগ। 'অজানা জ্বর', বার্ড ফ্লু, সোয়াইন ফ্লু, নিপা ভাইরাস যখন তখন কেড়ে নিচ্ছে বহু তাজা প্রাণ। বিজ্ঞান ও সভ্যতার এত অগ্রগতি সত্ত্বেও জটিল অসুখ তো অনেক দূরের কথা, জ্বরের কারণও বহু ক্ষেত্রে নির্ণয় করা যাচ্ছে না। লোকসংখ্যা বাড়লেও আনুপাতিক হারে বেড না বাড়ার ফলে দিনের পর দিন নানা হাসপাতালে ঘুরে 'বেড নেই' শুনতে শুনতে বিষণ্ণ মুখে বাড়ি ফেরাই এখন সরকারি চিকিৎসার মডেল। আর যাঁদের কপালে কোনও ক্রমে শিকে ছেঁড়ে তাঁদের একাধিক রোগীকে একটা বেডে ঘেঁষাঘেঁষি করে থাকতে হয়, কিংবা রোগীকে হাসপাতালের মেঝেতে রাখা হয়। এ ছাড়াও ফ্রি-বেড কমেছে, ওষুধ ও পথ্য রোগীর জন্য যতটুকু বরাদ্দ ছিল তাও বন্ধ হওয়ার মুখে।

সরকারি হাসপাতালে পরিকাঠামোর অভাবে মানুষের হয়রানির অন্ত নেই। আউটডোরে টিকিটের লম্বা লাইন, কোনও পরীক্ষার ডেট পেতে কখনও ২-৩ মাসেরও বেশি সময় লাগে। ততদিনে রোগী হয় মারা গেছেন, নয়তো ঘটি-বাটি বিক্রি করে নার্সিংহোমের দ্বারস্থ হতে বাধ্য হয়েছেন। ছোট-বড় সমস্ত সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে মুমূর্ষু রোগীর জন্য বেড নেই, রক্ত নেই, এক্স-রে প্লেট নেই, ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষার সরঞ্জাম নেই, কাজ করার লোক নেই, ডাক্তার নেই, ডাক্তার থাকলে নার্স নেই, নার্স থাকলে অন্য স্বাস্থ্যকর্মী নেই— জনগণ যেন এক নেই রাজ্যের বাসিন্দা। তবে ওয়ার্ডে কুকুর, বিড়াল, ইঁদুর এমনকী বিষধর সাপের অভাব নেই। তার উপর হাসপাতাল জুড়ে ক্ষমতাসীন শাসক দলের মদতে চলে দালাল রাজ। সেখানে অবশ্য চুরি, দুর্নীতি, অপচয় এবং স্বজন-পোষণের অভাব নেই। হাসপাতাল চত্বরে মদ, গাঁজা, সাট্টা, চরস, জুয়ার অবাধ কারবার চলে।

জনসাধারণের স্বাস্থ্য সুনিশ্চিত করার বহু বিষয়ের মধ্যে সর্বপ্রথম আসে রাষ্ট্রের তরফে আর্থিক অনুদানের প্রশ্ন। দেশে স্বাধীনতার পরেই গঠিত মুদালিয়র কমিশন কেন্দ্রীয় বাজেটের ১০ শতাংশ স্বাস্থ্য পরিষেবায় ব্যয় করার সুপারিশ করেছিল। কেন্দ্র ও রাজ্যগুলিতে ক্ষমতাসীন সরকারগুলি 'গরিব দেশ' এবং 'টাকার অভাব' এই চিরাচারিত বুলি আওড়ে স্বাস্থ্যখাতে ক্রমাগত ব্যয়-বরাদ্দ কমিয়েছে। কেন্দ্রের বর্তমান বিজেপি সরকার স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় করে জিডিপি-র মাত্র ১.০২ শতাংশ। বিজেপি-র কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রী জে পি নাড্ডা ১৯ জুন এক রিপোর্ট পেশ করতে গিয়ে স্বীকার করেছেন, স্বাস্থ্যক্ষেত্রে ভারতের ব্যয় পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে কম। বিশ্বের নিম্ন আয়ের দেশ হিসেবে পরিচিত শ্রীলঙ্কা ব্যয় করে ভারতের তুলনায় মাথা পিছু চারগুণ বেশি, সেখানে ভারত প্রতি বছর মাথাপিছু ব্যয় করে ১,১১২ টাকা। অর্থাৎ প্রতিদিন ৩ টাকা, কী বিচিত্র এই দেশ। এক কাপ চায়ের দামও এর থেকে বেশি। ইন্দোনেশিয়া ব্যয় করে ভারতের দ্বিগুণ। স্বাস্থ্যখাতে মালদ্বীপ জিডিপি-র ৯.৪ শতাংশ, ভূটান ২.৫ শতাংশ এবং থাইল্যান্ড ২.৯ শতাংশ ব্যয় করে।

দেশের এই করুণ স্বাস্থ্যচিত্রের কারণ কি সত্যই টাকার অভাব? দেশে সত্যিই টাকার অভাব হলে অস্ত্রের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক বাজারে ভারতবর্ষ সবচেয়ে বড় ক্রেতা হয় কী করে? কেন্দ্র ও রাজ্যস্তরের নানা আর্থিক দুর্নীতিতে লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা লুট হয়ে যাচ্ছে। নীরব মোদি, মেহুল চোকসি, বিজয় মাল্য সহ দেশের বড় বড় শিল্পপতিদের লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা ঋণ মকুব এবং কর ছাড় দেওয়া হচ্ছে, এমএলএ-এমপি-দের বেতন লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। এসব কি দেশে টাকার অভাবের লক্ষণ!

জনসাধারণের স্বাস্থ্যের মান যাই হোক না কেন নেতা-মন্ত্রী-আমলাদের আরাম-আয়েশ, বিলাস-ব্যসন, চার্টার্ড বিমানে ঘোরাফেরা, বিদেশ ভ্রমণ, প্রধানমন্ত্রীর দামি পোশাক ইত্যাদি কিন্তু অটুট থাকে। তাই অভাব অর্থের নয়, অভাব জনমুখী দৃষ্টিভঙ্গির। ১৯৯৬ সালে সুপ্রিম কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের রায়ে বলা হয়েছিল সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় প্রতিটি নাগরিকের বিনা পয়সায় চিকিৎসা পাওয়ার অধিকার আছে। সে বিষয়ে সরকারগুলি সম্পূর্ণ উদাসীন এবং কৌশলে মেডিকেল কলেজ থেকে শুরু করে জেলা হাসপাতালগুলিতে এমআরআই, সিটি স্ক্যান, ইউএসজি, ইসিজি, প্যাথোলজি ইত্যাদি পরিষেবাগুলি বিভিন্ন ব্যবসায়ীগোষ্ঠীকে দিয়ে দিয়েছে। স্বাস্থ্য নিয়ে ব্যবসা করে অবাধ মুনাফা লুটতে সারা দেশজুড়ে গড়ে উঠেছে বেসরকারি বিলাসবহুল ব্যয়সাপেক্ষ নার্সিংহোম। পুঁজিপতি ব্যবসায়ীদের ম্যানেজার এই সরকারগুলি এখানেই থেমে থাকেনি। বৃহৎ ব্যবসায়ীদের স্বার্থে সামগ্রিকভাবে স্বাস্থ্যপরিষেবাকে বিমা নির্ভর করতে চাইছে। নার্সিংহোমগুলির অমানবিক আচরণ সকলেরই অত্যন্ত পরিচিত। রোগীদের বেশি দিন রেখে দেওয়া, প্রয়োজনাতিরিক্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করানো এবং সবশেষে রোগীর পরিবারের ঘাড়ে মাত্রাতিরিক্ত বিল চাপানো সহ এই বিলের টাকা বিমা কোম্পানির কাছ থেকে পাওয়ার জন্য রোগীর পরিজনের মারাত্মক হয়রানির অভিজ্ঞতা আছে। ফলে চিকিৎসা হয়ে উঠছে বিমা নির্ভর। পকেট ভরছে ইনসিওরেন্স কোম্পানি ও নার্সিং হোম মালিকদের।

আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের ব্যাপক অগ্রগতি ঘটেছে। গবেষণার ফলে অনেক অসুখ সূচনাতেই ধরে ফেলা ও তার নিরাময় সম্ভব। কিন্তু বাদ সাধছে বাজার অর্থনীতি। গবেষণা থেকে শুরু করে যন্ত্রপাতি, ওষুধ বিক্রি, আমদানি-রপ্তানি সবই বহুজাতিক বাণিজ্যিক সংস্থাগুলি নিয়ন্ত্রণ করছে শুধু তাদের মুনাফার স্বার্থে।

অবহেলায় মরছে একটা ভারতবর্ষ, জীবন যন্ত্রণায় ধুঁকছে, বিনা চিকিৎসায় মরছে— আর একটা ভারতবর্ষ উঠে যাচ্ছে বিশ্বের ধনীদের প্রথম সারিতে। এই কি স্বাধীন দেশের নাগরিকদের ভবিতব্য?

জীবনাবসান

দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার কুলতলির মৈপীঠ অঞ্চলে এসইউসিআই(সি)-র একনিষ্ঠ সমর্থক কমরেড যশোদা মণ্ডল হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ৬ জুলাই শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৩ বছর।

কুলতলির মৈপীঠ এস ইউ সি আই (সি)-র নেতৃত্বে সংগ্রামী বামপন্থার ঝান্ডাকে ঊর্ধ্বে তুলে রাখার ক্ষেত্রে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। অতি সাধারণ এক গ্রাম্য মহিলা হয়েও কমরেড যশোদা মণ্ডল ছিলেন সেই লড়াইয়ের গুরুত্বপূর্ণ সৈনিক।

১৯৮৯ সালের ৯ ডিসেম্বর সিপিএমের বন্দুক বাহিনী মৈপীঠে নারকীয় হত্যাকাণ্ড চালিয়ে পুলিশের সহযোগিতায় এলাকার দখল নেয়। তারপর থেকে প্রায় কুড়ি-বাইশ বছর মৈপীঠে এসইউসিআই(সি)-র নাম উচ্চারণ করলেও ভয়াবহ অত্যাচার চলত। বহু কর্মী-সমর্থক এই সময় প্রাণ হারিয়েছেন অথবা আহত হয়ে পঙ্গু হয়ে গেছেন। আর্থিক অবরোধ, ঘর-বাড়ি জ্বালানো, মাঠের ধান-পুকুরের মাছ বারবার নষ্ট করে দিয়ে সিপিএম বাহিনী এসইউসিআই(সি) সমর্থক পরিবারগুলিকে নতিস্বীকার করাতে চেয়েছে। সেই অত্যাচারের মধ্যেও কমরেড যশোদা মণ্ডল দলের ঝান্ডাকে যথাসাধ্য তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন।

ওই সময় যে কোনও নির্বাচনে এসইউসিআই(সি) সমর্থকদের বুথের কাছে যেতেও সিপিএম গুন্ডাবাহিনী বাধা দিত, মারধর করত। কমরেড যশোদা মণ্ডল ভোটের আগের দিন রাত দু'টা-আড়াইটা থেকে বুথের দরজায় বসে থাকতেন। মার খেয়েও যেভাবে হোক দলকে ভোট দিতেই হবে, এটা ছিল তাঁর চেষ্টা। তাঁকে সিপিএম গুন্ডারা গায়ের জোরে বুথ থেকে বের করে দিলেও তিনি হাল ছাড়তেন না।

মৈপীঠের সংগ্রাম সাধারণ মহিলাদের মধ্যেও যে দৃঢ় চরিত্রের জন্ম দিয়েছে, কমরেড যশোদা মণ্ডল ছিলেন তার অন্যতম প্রতীক। তাঁর প্রয়াণে দল এবং মৈপীঠের মানুষ এক দৃঢ়চেতা একনিষ্ঠ সংগ্রামীকে হারাল।

কমরেড যশোদা মণ্ডল লাল সেলাম

পাশ-ফেল ঃ দাবি না মেটা পর্যন্ত আন্দোলন চলবে

একের পাতার পর

ভাষায় বলেছে, পাশ-ফেল তুলে দেওয়ার ফলেই সরকার নিয়ন্ত্রিত স্কুলগুলিতে শিক্ষার মানে চূড়ান্ত ধস নেমেছে। স্কুলে স্কুলে শিক্ষার পরিবেশ বিনষ্ট হতে চলেছে। সর্বশিক্ষা মিশন তাদের রিপোর্টে বলছে অভিভাবকরা সরকারি স্কুলের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলেছেন। এই ধরনের অসংখ্য স্কুল যখন ছাত্রের অভাবে হয় বন্ধ হয়ে গিয়েছে, না হয় বন্ধ হতে বসেছে তখন দেশের সর্বত্র বেসরকারি স্কুলের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। দেশের বরেণ্য শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবীরা বার বার পাশ-ফেল ফেরানোর আবেদন জানিয়েছেন। কিন্তু কোনও কিছুই সরকারগুলি কানে তোলেনি। আমাদের রাজ্যে দীর্ঘ ৩৮ বছর এবং গোটা দেশে ৯ বছর এই সর্বনাশা নীতির ফলে কোটি কোটি ছাত্রছাত্রীর শিক্ষা ও ভবিষ্যৎ ধ্বংস হতে দেখেও জনদরদের স্বঘোষিত চ্যাম্পিয়ানদের বুক কাঁপেনি।

২০১৫-র শেষভাগে তৎকালীন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী স্মৃতি ইরানি প্রকাশ্যে জানান, তাঁরা পাশ-ফেল ফেরাতে চান এবং এর জন্য তাঁরা শিক্ষা আইন সংশোধন করবেন। এই ঘোষণার পর প্রায় আড়াই বছর পার হয়ে গিয়েছে। স্মৃতি ইরানির পর যিনি শিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী হয়েছেন, তিনিও মাঝে একাধিকবার একই কথা শুনিয়েছেন। কিন্তু এর মধ্যে শিক্ষা আইনের সংশোধনী সংসদে পেশ করার সময় ও সুযোগ তারা করে উঠতে পারেনি। এই হল তাদের শিক্ষা দরদের নমুনা।

রাজ্যের ক্ষেত্রেও তৃণমূল সরকারের একই টালবাহানা। গত বছর ১৭ জুলাই প্রথম শ্রেণি থেকে পাশ-ফেলের দাবিতে এসইউসিআই (সি)-র ডাকা সাধারণ ধর্মঘটের পক্ষে ব্যাপক জনসমর্থন লক্ষ করে রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী এসইউসিআই(সি)-র রাজ্য সম্পাদককে লিখিতভাবে জানিয়েছিলেন, তাঁরাও পাশ-ফেল চান এবং তা চালু করার উদ্যোগ তাঁরা নেবেন। বিভিন্ন শিক্ষক সংগঠনের মতামত নেওয়া হয়। সিপিএম ছাড়া সকলেই প্রথম শ্রেণি থেকে পাশ-ফেল চালুর মত দেয়। কিন্তু তার পর এক বছর পার হয়ে গেলেও বিধানসভায় এ বিষয়ে একটি ঘোষণা এবং পরে একটি বৈঠক ছাড়া আর কিছুই রাজ্য সরকার করেনি। এদিকে ক্ষতি যা হওয়ার হয়েই চলেছে। জনস্বার্থের প্রতি বিন্দুমাত্র দায়বদ্ধতা থাকলে শিক্ষার মতো গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়ে এ আচরণ কোনও সরকার করতে পারে কি?

দেশের কোটি কোটি ছাত্রছাত্রীর শিক্ষা ও ভবিষ্যৎকে রক্ষার স্বার্থে এই টালবাহানা এবং কালক্ষেপ অবিলম্বে বন্ধ হওয়া দরকার। কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রীর বক্তব্য, তাঁরা পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণিতে দু'টি পরীক্ষা চালু করবেন। সেখানে ছাত্রছাত্রীরা কাঙ্ক্ষিত মান অর্জনে ব্যর্থ হলে তাদের সেই ক্লাসে রেখে দেওয়া হবে। কিন্তু এতে অবস্থার বিশেষ হেরফের হবে কি? পাশ-ফেল বিহীন প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষাটাই যেখানে প্রহসনে পর্যবসিত হয়েছে, মাত্র দু'টি ক্লাসে পাশ-ফেল ফিরিয়ে এনে তার সমাধান সম্ভব কি? কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অবশ্য বলেছেন, কোন ক্লাস থেকে পাশ-ফেল চালু হবে, রাজ্য সরকার চাইলে সেই সিদ্ধান্ত নিতে পারে। ইতিপূর্বে খবরে প্রকাশ, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নাকি তৃতীয় শ্রেণি থেকে পাশ-ফেল ফেরানোর কথা ভাবছেন। তাঁর কাছে প্রশ্ন, যদি ফেরাতেই হয় তবে প্রথম শ্রেণি থেকেই নয় কেন? তা ছাড়া শিক্ষা তো যুগ্ম তালিকাভুক্ত। তবে কেন্দ্রের মুখের দিকে তাকিয়ে তাঁরা সাধারণ পরিবারের অগণিত ছাত্রছাত্রীর এতবড় ক্ষতি হতে দিচ্ছেন কেন?

দেশের নেতারা সেকুলার কথাটির অর্থই বদলে দিয়েছেন

৫ আগস্ট সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের স্মরণ দিবস উপলক্ষে তাঁর 'ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক আন্দোলন ও আমাদের কর্তব্য' পুস্তিকা থেকে একটি অংশ প্রকাশ করা হল।

আপনি শত চেষ্টা করলেও আদর্শ, রুচি ও মূল্যবোধের কোনও একটি বিশেষ উন্নত মানকে একটি জায়গায় ধরে রাখতে পারেন না— তা সে শরৎচন্দ্র, নজরুল, রবীন্দ্রনাথের রুচির মানই হোক, আর বুদ্ধ, শঙ্করাচার্য, যিশুখ্রিস্ট কিংবা মহম্মদ, আর মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন— তাঁদের যে কোন তত্ত্ব এবং মূল্যবোধের ধারণাই হোক। তাকে একটা জায়গায় চিরস্থায়ী করতে গেলেই তা প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে পড়বে। আর একটি বিষয় আলোচনা করলে এই বিষয়টা আরও পরিষ্কার হবে। মানসিকতা বলতে আমরা কী বুঝি? চিন্তা এবং ভাব কী? আমরা জানি, একদিকে ব্যক্তি মস্তিষ্ক ও বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে নিয়ত দ্বন্দ্ব-সংঘাত অপরদিকে ব্যক্তি মস্তিষ্কের সাথে তার নিজস্ব সামাজিক পারিপার্শ্বিকতার দ্বন্দ্ব— এই দুই দ্বন্দ্বের ফলেই ব্যক্তিচিন্তা ও মননশীলতার বিকাশ ঘটছে। সমাজের সমস্ত মানুষের এই চিন্তাগুলির বা মননশীলতার সাধারণীকরণের (জেনারালাইজেশন) মধ্য দিয়েই সামাজিক মানসিকতার সৃষ্টি, যাকে আমরা এককথায় সমাজমনন বা সমাজচিন্তা (social thinking) বলে থাকি। একদিকে এই সমাজচিন্তার ভেতরকার দ্বন্দ্ব ও তার সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতি ও বহির্জগতের দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়েই ক্রমাগত মানুষের মানসিকতার বিকাশ ও ভাবজগতের সৃষ্টি হয়ে চলেছে। এই দ্বন্দ্বকে কেউই এক জায়গায় বাঁধতে পারে না। সমস্ত মানুষের মননশীলতার এই যে দুই ধরনের দ্বন্দ্ব, একে যদি এক জায়গায় বাঁধতে পারতাম, তা হলে ভাবজগতকেও এক জায়গায় বাঁধা সম্ভব হত। তাই কোনও এক জায়গায় থামবার উপায় নেই। কাজেই যত প্রগতিশীল ভাবনা-ধারণাই হোক না কেন, তাকে চিরস্থায়ী করে এক জায়গায় দাঁড় করাতে গেলেই অমনি তার মানে অন্যরকম হয়ে দাঁড়ায়, তা প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে পড়ে।

পূর্বেই আমরা আলোচনা করেছি, গতি দুই ধরনের— যেটা সামনে ঠেলে তা প্রগতিশীল, আর যা আমাদের পেছন দিকে নিয়ে যায় তা প্রতিক্রিয়াশীল। আজকের সামাজিক প্রয়োজনে, অর্থাৎ প্রগতির পরিপূরক অর্থে যে আদর্শবাদ আজ সবচেয়ে উন্নত চেতনার মানকে নির্দেশ করছে— অবস্থার পরিবর্তনের সাথে সাথে, অর্থাৎ উৎপাদনের উপায় ও জীবনধারা পাল্টাবার সাথে সাথে যে নতুন প্রয়োজনবোধের জন্ম হচ্ছে, তার সঙ্গে তাল রেখে যদি আমরা আমাদের ভাবনা-ধারণা, চিন্তা, আদর্শবাদ ও মূল্যবোধ— এগুলোকে ক্রমাগত পাল্টাতে ও আরও উন্নত করতে না পারি, তাহলে কী হয়? তাহলে এক সময়ের প্রগতিশীল আদর্শ, পরবর্তী সময়ে আর একটা পরিবর্তিত অবস্থায় উৎপাদন ও জীবনপদ্ধতি পাল্টাবার সাথে সাথে নতুন প্রয়োজনবোধের মাপকাঠিতে প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে পড়ে। ফলে, তা আমাদের ক্রমাগত নিচের দিকে টেনে নামাতে থাকে। এইভাবে সমস্ত ভাবাদর্শের মূল্যায়ন করতে হয়। এই ভাবেই আদিম সমাজ থেকে মানুষের চিন্তা ও তার ভাবজগৎ স্তরে স্তরে একটাকে ছাড়িয়ে আর একটা উন্নত স্তরে উন্নীত হতে হতে আধুনিক চিন্তা ও ভাবনা-ধারণাগুলির আমরা সন্ধান পেয়েছি। একথা না মানলে, আমার একটা প্রশ্নের জবাব আপনারা কেউ দিতে পারবেন না বলে আমার ধারণা। যেমন ধরুন, বুদ্ধ, শঙ্করাচার্য, যিশুখ্রিস্ট, মহম্মদ— এই বিরাট মানুষগুলোর ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে মানবসমাজে উপস্থিতির কথা আমরা সবাই জানি। যাঁরা ধর্মপ্রাণ, তাঁরা অবশ্য ওঁদের ঈশ্বরের সন্তান মনে করেন, ঈশ্বর প্রেরিত দূত বলে মনে করেন, 'প্রফেট' (prophet) মনে করেন। কিন্তু যাঁরা মানবতাবাদী, আধুনিক চিন্তায় যাঁরা উদ্বুদ্ধ, তাঁরা ওঁদের বিরাট পুরুষ, অনন্য ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ বলেই মনে করেন। আজকাল আমরা যাঁদের কথায় কথায় বড় মানুষ বলে থাকি, তাঁদের সঙ্গে এইসব বিরাট মানুষগুলোর কোনও তুলনাই হয় না। তদানীন্তন পরিস্থিতিতে তাঁদের প্রতিভার যে প্রমাণ তাঁরা রেখে গেছেন, আমরা কয়জন আজকের পরিস্থিতিতে তুলনামূলক বিচারে সেই প্রতিভার স্বাক্ষর রাখতে পারছি। তবুও একটু খেয়াল করলেই একটা জিনিস আমাদের নজরে পড়বে। বুদ্ধ, শঙ্করাচার্য, মহম্মদের মতো বিরাট প্রতিভাবান ব্যক্তিদের মননশীলতার দ্বারা, আজ যে আধুনিক চিন্তাধারা ও ভাবনা-ধারণাগুলো আপনারা লালনপালন করেন, তা সৃষ্টি করা সম্ভব হয়নি। অত্যন্ত উঁচুমানের মননশীলতা থাকা সত্ত্বেও তাঁরা আধুনিক চিন্তা ও ধ্যান-ধারণাগুলোর জন্ম দিতে পারেননি। যেমন, গণতান্ত্রিক চেতনা, গণতান্ত্রিক সমাজগঠন, 'সেকুলারিজম' (ধর্মনিরপেক্ষতা), 'সেকুলার হিউম্যানিজম' (ধর্মনিরপেক্ষ বা পার্থিব মানবতাবাদ) প্রভৃতি ভাবনা-ধারণা ও মতাদর্শের কথা এবং এইগুলোকে ভিত্তি করে ব্যক্তিস্বাধীনতা, নারীর স্বাধীনতা, 'লিবার্টি' ও 'ফ্রিডম' প্রভৃতি নতুন মূল্যবোধগুলোর কথা যদি ধরি, তা হলে দেখব, শিল্পবিপ্লব বা পুঁজিবাদী বিপ্লবকে কেন্দ্র করে উৎপাদন ব্যবস্থা পাল্টাবার সাথে সাথে এই যে সব আধুনিক ভাবনা-ধারণাগুলোর জন্ম হল— এগুলোর কথা এমনকী স্কুলের ছাত্ররাও আজকাল অল্পবিস্তর জানে। অথচ এইসব কিন্তু বুদ্ধ, মহম্মদ, শঙ্করাচার্য, যিশুখ্রিস্টের মতো প্রতিভাবানদের পক্ষেও চিন্তা করা সম্ভব হয়নি। এটা এজন্য নয় যে, প্রতিভা তাঁদের আমাদের থেকে কম ছিল, বা উচ্চচিন্তা তাঁরা করতে পারতেন না। এরূপ ঘটার কারণ এই যে, সমস্ত মানুষের চিন্তার 'মেটেরিয়াল কন্ডিশন' (বাস্তব পরিবেশ) আগে তৈরি হয় তবে তার ভাবজগতের সৃষ্টি হয়। এইখানেই মানুষের চিন্তাশক্তির আপেক্ষিক স্বাধীনতার সীমা। এই সত্য যারা মানে না, তাদের আমি একটা প্রশ্নের জবাব দিতে বলব। আজকের যেসব উচ্চ আদর্শবোধ বা আধুনিক ভাবনা-ধারণাগুলির আমরা অধিকারী, তাঁদের চিন্তায় সেদিন কেন তা জন্ম নেয়নি? চিন্তার সীমাহীন (absolute) স্বাধীনতায় যাঁরা বিশ্বাসী, যাঁরা মনে করেন 'স্বাধীন চিন্তাসত্তা'ই ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে ভাবজগতের সৃষ্টি করে চলেছে, তাঁদের আমার এ প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। এ প্রশ্নের সম্মুখীন হলেই তাঁরা বুঝতে পারবেন, চিন্তাশক্তির এই স্বাধীন সত্তার ধারণা মিথ্যা, অলীক। আসলে প্রত্যেকটি ব্যক্তিচিন্তারই একটা আপেক্ষিক স্বাধীনতা আছে এবং তার আবার একটা সীমাও আছে। সেই সীমাটা বাস্তব পরিবেশের (material condition) সীমা।

তাহলে আমরা কী দেখছি? আপনার চিন্তা, আমার চিন্তা, অজয়দার (পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী) চিন্তা, বা যে কোনও ব্যক্তির চিন্তা— বাস্তবে আসলে এগুলো কী? কীভাবে বিভিন্ন ব্যক্তির এই চিন্তাধারা গড়ে উঠছে? এটা বুঝতে হলে আমাদের প্রথমে বোঝা দরকার, সমাজচিন্তা বলতে আসলে কী বোঝায়? 'সোস্যাল থিংকিং' বা সমাজ চিন্তা বলতে আমরা একটা বিশেষ সমাজের একটা সুনির্দিষ্ট আদর্শগত-সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলকে (distinct ideological-cultural category) বুঝিয়ে থাকি— যার মধ্যেই বিভিন্ন পরস্পরবিরোধী চিন্তাধারা ও ভাবনা-ধারণার নিয়ত দ্বন্দ্ব-সংঘাত চলছে। কেন চলছে, কীভাবে চলছে— সে সম্বন্ধে যার যা তত্ত্বই থাকুক না কেন, বহু রকমের চিন্তা যে একটা সমাজচিন্তার পরিমণ্ডলের মধ্যেই রয়েছে— সে সম্বন্ধে বোধহয় কোনও দ্বিমত নেই। একটা বিশেষ পরিবেশ বা পরিস্থিতির মধ্যে নানা ভাবনা চিন্তা ও তাদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব-সংঘাত নিয়েই আমরা একটা সমাজচিন্তার পরিমণ্ডলকে বুঝিয়ে থাকি। সমস্ত মানুষের চিন্তায় সেই সমাজচিন্তারই ব্যক্তিকরণ ঘটছে, 'পারসনিফিকেশন' ঘটছে। ব্যক্তির মধ্য দিয়ে সমাজচিন্তার এই প্রকাশকেই (personified social thinking) আমরা বলি ব্যক্তি-চিন্তা। শঙ্করাচার্যের চিন্তাও এইভাবেই গড়ে উঠেছে। যিশুখ্রিস্টের চিন্তাও এইভাবেই গড়ে উঠেছে, মহম্মদের চিন্তাও এইভাবেই গড়ে উঠেছে। রাজা রামমোহন রায়, নজরুল, শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও বিভিন্ন রাজনৈতিক চিন্তানায়কদের চিন্তাও এইভাবেই গড়ে উঠেছে। এর বাইরে যাওয়ার উপায় নেই। মানুষের মস্তিষ্কের সাথে সমাজ পরিবেশ ও বহিঃপ্রকৃতির দ্বন্দ্বের দ্বারা এটা সীমায়িত। সুতরাং, মানুষের ভাবজগৎ, অর্থাৎ মানুষের চিন্তা ও ভাবনা-ধারণার জগৎ বস্তু থেকেই গড়ে উঠেছে, বাস্তব পরিবেশ অনুযায়ী গড়ে উঠেছে। আবার মনে রাখতে হবে একইসাথে বাস্তব পরিবেশের সঙ্গে তা দ্বন্দ্ব-সংঘাতময়। এরকম নয় ব্যাপারটা যে, উৎপাদনের উপায় ও জীবনধারণের পদ্ধতি পাল্টাচ্ছে, আর সঙ্গে সঙ্গেই মানুষের মন ও ভাবনাগুলো পাল্টে যাচ্ছে। এরকম ধারণা ভুল। এরকম যান্ত্রিক নয় ব্যাপারটা। দু'য়ের সম্পর্ক দ্বান্দ্বিক। যদিও বস্তুগত উৎপাদনের উপরকাঠামো (superstructure) হিসাবেই মানুষের ভাবগত উৎপাদন বা ভাবজগৎ গড়ে উঠেছে, সমাজচিন্তা জন্ম নিচ্ছে, এই ভাবজগৎ এবং সমাজচিন্তা আবার বাস্তব পরিবেশের পরিবর্তনের ধারায় ক্রমাগত তার প্রভাব বিস্তার করে চলেছে। কিন্তু কোনও অবস্থাতেই মানুষের ভাবজগৎ একটা নির্দিষ্ট বাস্তব পরিবেশের (given material condition) পরিধিকে অতিক্রম করে যেতে পারে না— তার সীমাকে অতিক্রম করতে পারে না। এবং পারে না বলেই অতীতের কোনও মনীষীর পক্ষেই আধুনিক চিন্তা ও ভাবনা-ধারণাগুলির জন্ম দেওয়া সম্ভব হয়নি। ...

মানবতাবাদের আগে গড়ে ওঠা প্রায় সমস্ত মতাদর্শগুলো ঐশ্বরিক বা ধর্মীয় মূল্যবোধের উপরই প্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ সমস্ত মানুষই ঈশ্বরের সন্তান, তাই সমস্ত মানুষের প্রতি প্রেম ও মমত্ববোধই ছিল এইসব ভাবাদর্শগুলির মূল কথা। ঈশ্বরের স্বীকৃতি থেকেই কতকগুলো মূল্যবোধের সৃষ্টি— যাকে আমরা দর্শনের ভাষায় 'প্রায়রি ভ্যালু' বা পূর্ব নির্ধারিত নীতিবোধ বলে থাকি। আর মানবতাবাদ, অর্থাৎ বুর্জোয়া মানবতাবাদ সেদিন যে মূল্যবোধের জন্ম দিয়েছিল সেগুলি মূলত গড়ে উঠেছিল মানুষকে কেন্দ্র করে। মানুষের সত্যিকারের প্রয়োজন ও সামাজিক চেতনাই ছিল সেদিন এই মূল্যবোধের কেন্দ্রবিন্দু। ধর্মীয় ভাবধারা ও অতিপ্রাকৃত সত্তার স্বীকৃতিজনিত মূল্যবোধের বিরুদ্ধে এই মানবতাবাদই প্রথম মানুষের সমাজে 'সেকুলার' এবং গণতান্ত্রিক ভাবনা-ধারণা ও মূল্যবোধ নিয়ে এলো। সেকুলার কথাটার বাংলা মানে পার্থিব। তাই সমস্ত সেকুলার ধারণার শুরুই অতিপ্রাকৃত সত্তার অস্বীকৃতির মধ্য দিয়ে (all secular concepts start with the non-recognition of any supernatural entity)। কিন্তু ভারতবর্ষে, আমাদের দেশে সেকুলার রাষ্ট্রের বর্তমানে মানে দাঁড়িয়েছে সমস্ত ধর্মে সমান উৎসাহদান। এরকম ঘটার পিছনে দেশের রাষ্ট্রনায়কদের, তত্ত্ববিদদের ও রাজনৈতিক নেতাদেরই যে মিলিত কৃতিত্ব রয়েছে— এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু আমরা হয় অজ্ঞতাবশত ভুল করছি, আর না হয় ইচ্ছা করেই ভুলে বসে আছি যে, সেকুলার রাষ্ট্র গঠনের ধারণাটি গড়ে উঠেছিল রাষ্ট্র, সমাজজীবন, অর্থনৈতিক জীবন, রাজনৈতিক আন্দোলন ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন— সমস্ত কিছুকে চার্চের প্রভাব বা ধর্মের প্রভাব থেকে মুক্ত করার জন্য। জীবন সম্পর্কিত পার্থিব গণতান্ত্রিক ধ্যানধারণা (secular concept of life) এবং পার্থিব মানবতাবাদের এই হল ভিত্তি। কংগ্রেসি রাষ্ট্রনায়ক ও বুর্জোয়া চিন্তাবিদদের কথা বুঝতে পারি। কিন্তু বহু তথাকথিত মার্কসবাদী ও কমিউনিস্ট নেতাদের চিন্তা, ভাবনা-

ছয়ের পাতায় দেখুন

বাসে ছাত্র কনসেশনের দাবিতে ডিএসও-র আন্দোলন

দার্জিলিং ঃ এআইডিএসও দার্জিলিং জেলা কমিটির উদ্যোগে ছাত্রছাত্রীদের জন্য বাসভাড়া এক-তৃতীয়াংশ করার দাবিতে ৯ জুলাই আরটিও-র কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। সংগঠনের পক্ষে ২০ জনের এক প্রতিনিধি দল এই ডেপুটেশন অংশগ্রহণ করে। ডেপুটেশনের পর মিছিল করে শিলিগুড়ি গার্লস স্কুল, হাকিমপাড়া গার্লস স্কুল ও শিলিগুড়ি বয়েজ স্কুল ঘুরে কোর্ট মোড়ে এসে সভা হয়। বক্তব্য রাখেন জেলা সম্পাদক কমরেড অপূর্ব মণ্ডল। এক সপ্তাহের মধ্যে দাবি না মানলে পুনরায় বিক্ষোভের কথা ঘোষণা করা হয়।

বাঁকুড়া ঃ বিপুল পরিমাণে বর্ধিত ভাড়া অবিলম্বে কমানো, ছুটির দিন সহ প্রতি দিনই পরিবহণে ছাত্র কনসেশন, বাসে ছাত্রদের হয়রানি বন্ধ, বিভিন্ন রুটে ভোরে ও সন্ধ্যের সময় পর্যাপ্ত বাসের ব্যবস্থার দাবিতে বাঁকুড়া জেলা ডিএসওর পক্ষ থেকে ১৩ জুলাই আরটিও-কে ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

ট্রাম্পের অমানবিক শরণার্থী নীতির বিরুদ্ধে ধিক্কার দেশে দেশে

লন্ডন গিয়েছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। পদে বসার পর এই প্রথমবার। সেখানকার মানুষ বিপুল 'অভ্যর্থনা' জানিয়েছেন তাঁকে! না, ফুল হাতে নয়— প্রতিবাদী ব্যানার তুলে ধরে, ভেঁপু বাজিয়ে, ট্রাম্পের কার্টুন আঁকা পুতুল-বেলুন উড়িয়ে সে দেশের জনসাধারণ সোচ্চারে বুঝিয়ে দিয়েছেন শরণার্থী মায়ের কোল থেকে শিশু কেড়ে নেওয়ার অমানবিক নিদান হাঁকা এই প্রেসিডেন্টকে স্বাগত জানাতে রাজি নন তাঁরা।

১৩ জুলাই ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী টেরেসা মে-র সঙ্গে বৈঠক ছিল ট্রাম্পের। ক্ষোভের আঁচ টের পেয়েই বোধহয় রাজধানী শহর থেকে ১০০ কিমি দূরে এই বৈঠকের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সম্প্রতি মেক্সিকো সীমান্তে আছড়ে পড়া শরণার্থীর ঢল আটকাতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট 'জিরো টলারেন্স' নীতি ঘোষণা করেছেন। সেই অনুযায়ী শরণার্থীদের গ্রেপ্তার করে তাঁদের কাছ থেকে শিশু সন্তানদের কেড়ে নিয়ে ভরে দেওয়া হচ্ছে নানা ডিটেনশন সেন্টারে। এই অমানবিকতার বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছে সারা বিশ্ব। এ দিন লন্ডনের রাস্তায় রাস্তায় হাজার হাজার বিক্ষোভকারী ধিক্কার জানিয়েছেন ট্রাম্পের শরণার্থী-নীতিকে। অসহায় মানুষের প্রতি সহমর্মিতা জানিয়ে তাঁদের ব্যানারে লেখা ছিল— 'জঞ্জালের গাদায় ছুঁড়ে ফেলে দাও ট্রাম্পকে', 'মানবাধিকার কোনও সীমান্ত মানে না', 'আমরা সবাই ধরিত্রী মায়ের সন্তান' ইত্যাদি। শিশুদের সঙ্গে নিয়ে মিছিলে পা মিলিয়েছিলেন অসংখ্য মা। মিছিলগুলি লন্ডনের রিজেন্ট স্ট্রিট, পিকাডেলি সার্কাস হয়ে প্রধান বিক্ষোভস্থল ট্রাফালগার স্কোয়ারে পৌঁছয়।

পরদিন ট্রাম্প গিয়েছিলেন স্কটল্যান্ডে। সেখানে পা রাখার আগেই দেশের সর্ববৃহৎ শহর গ্লাসগোতে সমবেত হয়েছিলেন হাজার হাজার বিক্ষোভকারী। স্লোগানে ব্যানারে সাজানো মিছিলে তাঁরাও সোচ্চারে ধিক্কার জানিয়েছেন বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের প্রধান মুখ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে। প্রেসিডেন্টের নিজের বাসভূমি খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মানুষও গত ৩০ জুন জাতীয় শরণার্থী দিবসে আমেরিকার পূর্ব থেকে পশ্চিম, উত্তর থেকে দক্ষিণ সর্বত্র ৭০০-রও বেশি ছোট বড় শহরে বিক্ষোভ দেখান। হাজার হাজার মার্কিন নাগরিক সামিল হন বিক্ষোভ মিছিলে।

৩০ জুন, শিকাগোতে বিক্ষোভ

শ্রমজীবী মানুষের বিভিন্ন সংগঠন, বিভিন্ন বামপন্থী সংগঠন ছাড়াও হাজার হাজার সাধারণ মানুষ শরণার্থীদের প্রতি সংহতি জানিয়ে ট্রাম্পবিরোধী স্লোগান দেন। বিশ্ব জুড়ে অভিবাসী মানুষ এবং প্যালেস্টাইন সহ বিভিন্ন দেশের শরণার্থীদের প্রতি সংহতি জানান তাঁরা। বিক্ষোভ সমাবেশগুলিতে বক্তাদের অনেকেই বলেন, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদই পৃথিবীর দেশে দেশে মানুষকে উদ্বাস্তুতে পরিণত করছে। এই অমানবিকতা রুখতে সকলেই সাম্রাজ্যবাদবিরোধী শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তোলার প্রয়োজনের কথা ঘোষণা করেন।

জিএসটির এক বছর
জনগণ কোনও সুফল পায়নি

বহু ঢাকঢোল পিটিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার জিএসটি-র বর্ষপূর্তি পালন করল। মন্ত্রীসভার সদস্যরা একে ঐতিহাসিক বলে আখ্যায়িত করলেন। কিন্তু কেন তা ঐতিহাসিক? সরকার কোনও ব্যাখ্যা দেয়নি। ২০১৭-র ১ জুলাই প্রধানমন্ত্রী মহা সমারোহে চালু করেছিলেন জিএসটি (গুডস অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্যাক্স)। সরকার বলেছিল, পণ্য বিক্রি ও পরিষেবার জন্য কেন্দ্রীয় বিক্রয় কর, ভ্যাট, পরিষেবা কর ইত্যাদি নানা নামের করের বদলে শুধুমাত্র একটি কর জিএসটি দিতে হবে। বলেছিল, জিএসটি চালু হলে জিনিসপত্রের দাম কমবে। ব্যবসা বাণিজ্যের সুবিধা হবে, ফলে বাজার সংকট কাটবে। জিএসটি-র বর্ষপূর্তিতে সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতা কী? জিনিসপত্রের দাম কমেছে? ছোট ব্যবসা, ছোট কারখানার কিছু সুবিধা হল, না লাটে ওঠার জোগাড়?

বাস্তব হল জিনিসের দাম বেড়েই চলেছে। ওষুধ, দুধ, আটা, ভোজ্য তেল, খাদ্যশস্যের মতো গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য জিনিসের উপর জিএসটি ধার্য হওয়ায় দাম বেড়েছে অনেক। ব্যাঙ্ক বা কোনও আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে পরিষেবা নিতে গেলেই গ্রাহককে জিএসটি বাবদ বেশি অর্থ ব্যয় করতে হচ্ছে। বেড়েছে এটিএম ব্যবহারের খরচ, ক্ষুদ্র ঋণ সহ সব ধরনের ব্যাঙ্কঋণের প্রসেসিং চার্জ। জীবনবিমার প্রিমিয়াম বেড়েছে। পরিবহণে বহু ক্ষেত্রে ২৮ শতাংশ পর্যন্ত জিএসটি দিতে হচ্ছে। ফলে পণ্য ও যাত্রী পরিবহণের খরচ বাড়ছে।

জিএসটি রিটার্নের গোলমেলে জটিলতার সুযোগে যে হাওয়ালা লেনদেন বেড়েছে তা বিশেষজ্ঞরাই বলছেন। ফলে কালো টাকার কারবার বেড়ে উঠেছে। কিছু অর্থনীতিবিদ সুইস ব্যাঙ্কে ভারতীয়দের জমা টাকা বিপুল হারে বেড়ে ওঠার সাথে জিএসটি রিটার্নের ফাঁকফোকরের সম্পর্ক আছে এমনও বলছেন।

কেন্দ্রীয় সরকারের অবশ্য আয় বেড়েছে বলে ভারপ্রাপ্ত অর্থমন্ত্রী পীযূষ গয়াল বলেছেন। কিন্তু রিজার্ভ ব্যাঙ্ক পরিসংখ্যান দিয়ে বলছে, জিএসটি চালু হওয়ায় রাজস্ব বাবদ আয় কমেছে রাজ্য সরকারগুলির। এই ঘাটতি পূরণের ব্যবস্থা করতে সাধারণ মানুষের পরিষেবা খাতে সরকারি ব্যয় কমছে। আবার এই অজুহাতে শিক্ষা-স্বাস্থ্য থেকে সড়ক নির্মাণের খরচ এমনকী পানীয় জলের দায়িত্বও সরকার তুলে দিচ্ছে বেসরকারি মালিকদের হাতে? তার খরচ জোগাচ্ছে সাধারণ মানুষই। অর্থাৎ ঘুরিয়ে বাড়তি বোঝা মানুষের ঘাড়ে চাপল।

অন্য দিকে খুচরো বিক্রেতা, ছোট ব্যবসায়ী, ছোট কারখানার মালিক, ছোট কন্ট্রাক্টর যাদের জিএসটি-র আওতাতে থাকার কথাই ছিল না, তারা জিএসটি রেজিস্ট্রেশন না করলে বড় ব্যবসাদার, বড় কারখানা তাদের সাথে চুক্তি বা লেনদেন করছে না। ফলে তাদের জিএসটি বাবদ মোটা অর্থ আগাম জমা করতে হচ্ছে। এমনিতেই তাদের হাতে পুঁজি কম, তার উপর একটা মোটা টাকা এভাবে দীর্ঘদিন আটকে থাকায় তারা বাজার থেকে সরে যতে বাধ্য হচ্ছে। তার জায়গা নিচ্ছে বড় পুঁজি। খুচরো ব্যবসা থেকে শুরু করে ছোটখাট কারিগরের কাজেও এই বড় পুঁজির থাবা বসছে। ঠিক এর আগে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা নোট বাতিলের জন্য মার খেয়েছিলেন, এরপর জিএসটির ধাক্কায় তাদের নাভিশ্বাস উঠছে, তাদের সঙ্গে যুক্ত লক্ষ লক্ষ কর্মচারী রুটি-রুজি হারাচ্ছেন।

সাধারণ মানুষের ক্ষোভকে কাজে লাগাতে কংগ্রেস জিএসটি নিয়ে বিজেপি সরকারের বিরোধিতা করলেও তারা নিজেদের আমলে জিএসটি চালুর জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। তখন বিরোধী বিজেপির বাধায় তা চালু করতে পারেনি। সেদিন বিজেপির বিরোধিতাও কোনও নীতিগত কারণে ছিল না, কংগ্রেসের এখনকার বিরোধিতাও যেমন নীতিগত কারণে নয়। এরা সকলেই একচেটিয়া কর্পোরেট পুঁজির স্বার্থে কাজ করে। সব ক্ষেত্রেই এই দলগুলি যখন ক্ষমতায় থাকে না সাধারণ মানুষের বন্ধু সেজে খুব বিরোধিতার খেলা করে, ভোট পেরোলে ক্ষমতায় যেতে পারলেই তাদের স্বরূপ বেরিয়ে পড়ে। তাই পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল কংগ্রেসও প্রথম দিকে জিএসটি-র বিরোধিতা করলেও পরে তা মেনে নিয়েছে।

সব মিলিয়ে বলা যায়, জিএসটি-র সুফল যদি মিলে থাকে, তবে তা মিলেছে শিল্পপতিদেরই।

১৪ জুলাই মালদা শহরে রথের মেলায় অবিলম্বে প্রথম শ্রেণি থেকে পাশ-ফেল চালুর দাবিতে স্বাক্ষর সংগ্রহ করছেন এসইউসিআই (সি) কর্মীরা

বৃদ্ধাকে ধর্ষণ, বিক্ষোভ এগরা থানায়

পূর্ব মেদিনীপুরের এগরার ছত্রি গ্রামে ৭১ বছরের এক আদিবাসী বৃদ্ধাকে আগে থেকে ছক কষে মদ্যপান করিয়ে ধর্ষণ ও পাশবিক নির্যাতন করে কয়েকজন দুষ্কৃতী। এই ঘটনার প্রতিবাদে এবং দোষীদের গ্রেপ্তার, নির্যাতিতার উপযুক্ত চিকিৎসা ও এলাকায় মদের ভাটি বন্ধ করার দাবিতে ১২ জুলাই এমএসএস, ডিএসও এবং ডিওয়াইও-র উদ্যোগে এগরা থানায় বিক্ষোভ ও ঘেরাও কর্মসূচি নেওয়া হয়।

দুষ্কৃতী খোকন সিং, অনন্ত নায়েক, বলাই সিং-রা ওই বৃদ্ধাকে সঙ্গে নিয়ে মদ্যপান করে। এরপর তারা তাঁকে ধর্ষণ করতে গেলে বৃদ্ধা প্রবল বাধা দেন। দুষ্কৃতীরা তাঁকে ব্যাপক মারধর করে। স্থানীয় মানুষ বৃদ্ধাকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে দেন। এই ঘটনা স্থানীয় মাতব্বররা গোপন করতে চাইলেও নির্যাতিতার পুত্র ও পুত্রবধূ স্থানীয় এমএসএস সংগঠক রেবতী দাসকে সবকিছু খুলে বলেন।

এসইউসিআই(সি) নেতৃত্ব বিষয়টির সন্ধান করতে হাসপাতালে যান ও নির্যাতিতার দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। ওই দিনেই এমএসএস, ডিএসও, ডিওয়াইও-র পক্ষ থেকে এগরা থানায় বিক্ষোভ দেখানো হয়। আন্দোলনের চাপে থানার ওসি নির্যাতিতাকে চিকিৎসার জন্য মেদিনীপুর হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন।

১৫ জুলাই ছত্রি গ্রামে শতাধিক মহিলা মদ ও নারী নিগ্রহ বিরোধী কনভেনশন আয়োজন করেন এবং মিছিল করে এলাকায় মদের ভাটি ভেঙে ফেলার দাবিতে আন্দোলনের ডাক দেন। এদিনের বিক্ষোভসভায় বক্তব্য রাখেন কমরেড রীতা প্রধান। আন্দোলনের চাপে পুলিশ একজন অভিযুক্তকে ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার করেছে।

হুগলিতে কমসোমলের শিবির

২৪ জুন হুগলির সোমরাবাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কমসোমলের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত জেলা শিবিরে ৬০ জন কিশোর-কিশোরী অংশগ্রহণ করেন। বসে আঁকো প্রতিযোগিতা, তাৎক্ষণিক বক্তৃতা ও কুইজ হয়। শেষে ফুটবল প্রতিযোগিতা হয়। শিবিরে উপস্থিত ছিলেন কমসোমলের রাজ্য বডির সদস্য কমরেড শিপ্রা হালদার। এসইউসিআই (সি)-র জেলা কমিটির সদস্য কমরেড সন্তোষ ভট্টাচার্যও উপস্থিত ছিলেন।

বরাকর, পশ্চিম বর্ধমান

নন্দীগ্রাম বিডিওতে বিক্ষোভ

১২ জুলাই পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দীগ্রামে এআইকেকেএমএস-এর বিক্ষোভ মিছিল হয়। গরিব কৃষকদের কৃষিঋণ মকুব, একশো দিনের কাজে ন্যায্য মজুরি প্রদান, ক্ষতিগ্রস্ত ফসলের ক্ষতিপূরণ প্রদান, অড়া ধান প্রতিরোধে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ ও অন্যান্য দাবিতে নন্দীগ্রাম বিডিও-র কাছে ডেপুটেশন দেন সংগঠনের সদস্যবৃন্দ।

সকল বেকারের কাজের দাবিতে ডিওয়াইও-র আন্দোলন

সমস্ত বেকারের কাজ, কাজ না দেওয়া পর্যন্ত বেকার ভাতা, সমস্ত সরকারি শূন্য পদে নিয়োগ, কাজের অধিকারকে সাংবিধানিক স্বীকৃতির দাবিতে এআইডিওয়াইও-র নেতৃত্বে সারা দেশ জুড়ে বিক্ষোভ আন্দোলন চলছে। দাবিগুলির সমর্থনে সংগঠন এক কোটি স্বাক্ষর সংবলিত দাবিপত্র নিয়ে পার্লামেন্ট অভিযানের ডাক দিয়েছে। জেলায় জেলায় তারই প্রস্তুতিতে স্বাক্ষর সংগ্রহ চলছে।

নতুনডি, পুরুলিয়া

ঐতিহাসিক হুল দিবস উপলক্ষে সভা

ঝাড়খণ্ডের দুমকায় ৯ জুলাই সিধু-কানহু-হুল বিদ্রোহ দিবস উপলক্ষে এক সেমিনারের আয়োজন করা হয়।
বিষয় ছিল 'ঐতিহাসিক হুল বিদ্রোহের শিক্ষা ও আমাদের কর্তব্য'।
সভায় বহু স্থানীয় মানুষ ও বিশিষ্টজন উপস্থিত ছিলেন।

দাম নেই, লঙ্কা ও বাদাম পুড়িয়ে এগরায় চাষিদের বিক্ষোভ

১৬ জুলাই পশ্চিম মেদিনীপুরে বিজেপির জনসভায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বক্তৃতায় জেলার লঙ্কা-চিনাবাদাম-পান চাষিদের সমস্যার কোনও কথাই শোনা গেল না। অথচ এটাইআজ ওই জেলার চাষিদের সমস্যা। প্রধানমন্ত্রীর সভার দিন তিনেক আগে পূর্ব মেদিনীপুরের এগরায় কৃষকরা এআইকেকেএমএস-এর নেতৃত্বে মহকুমা অফিসের সামনে রাস্তা অবরোধ করে দাবি জানান, লঙ্কা-চিনাবাদাম ও পানকে কৃষিপণ্য হিসাবে ঘোষণা করতে হবে, চাষিদের ব্যাঙ্কঋণ সহ শস্য বিমার সুযোগ দিতে হবে। এই ফসলগুলির ন্যূনতম সহায়কমূল্য ঘোষণা করে কিষানমান্ডিতে সরকারি উদ্যোগে কিনতে হবে, ফড়ে আড়তদারদের চক্র থেকে চাষিদের রক্ষা করতে মহকুমা ভিত্তিক টাস্ক ফোর্স গঠন করতে হবে, গড়তে হবে মহকুমা ভিত্তিক কিষানমান্ডি, ধানের সহায়ক মূল্য কমপক্ষে ২০০০ টাকা কুইন্টাল করতে হবে এবং সারা বছরই মান্ডি চালু রাখতে হবে।

কৃষক নেতা জগদীশ সাউ ক্ষোভের সাথে বলেন, গত দু' বছর ধরে মার্চ থেকে জুন লঙ্কা ৫-৭ টাকা কেজি দরে বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছেন চাষিরা। কেন্দ্র ও রাজ্য কোনও সরকারই চাষিদের লাভজনক দাম পাওয়ার ব্যবস্থা করেনি। তিনি বলেন, ২০১৭ সাল থেকে এআইকেকেএমএস-র লাগাতার আন্দোলনের ফলে রাজ্য কৃষিদপ্তর পানিপারুলে একটি লঙ্কা বিপণন কেন্দ্র করার সিদ্ধান্ত নেয় এবং মহকুমা শাসকের উদ্যোগে একটি টাস্ক ফোর্স গঠিত হয়। উল্লেখ্য, জগদীশ সাউ নিজে এই টাস্ক ফোর্সের অন্যতম সদস্য। তিনি জানান, শাসকদলের স্থানীয় গ্রাম প্রধান পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির মদতে টাস্ক ফোর্সকে নিষ্ক্রিয় রেখেছেন এবং প্রায় দেড় কোটি টাকা চাষিদের না দিয়ে অসাধু ব্যবসায়ীরা উধাও হয়ে গেছে। সরকারি উদ্যোগে ফসল কেনার ব্যবস্থা থাকলে এভাবে তারা চাষিদের ঠকাতে পারত না? তিনি দাবি জানান, এই টাকা উদ্ধারে সরকারকে হস্তক্ষেপ করতে হবে।

এগরা মহকুমায় প্রায় ২৫ হাজার হেক্টর জমিতে চিনাবাদাম চাষ হয়। সরকারি উদ্যোগে কেনার ব্যবস্থা না থাকায় ফড়ে-পাইকারদের চক্রে পড়ে মারাত্মক ক্ষতি হচ্ছে তাদের। এক কুইন্টাল চিনাবাদামের উৎপাদন মূল্য সাড়ে চার হাজার থেকে পাঁচ হাজার টাকা। চাষি বিক্রয় করে পাচ্ছেন মাত্র আড়াই হাজার টাকা। ফলে ক্ষুব্ধ চাষিরা এদিন কয়েক কুইন্টাল বাদাম পুড়িয়ে বিক্ষোভ দেখান।

চাষিদের অভিযোগ, এখানেও বাদাম সিন্ডিকেট খুবই সক্রিয়। স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যবসায়ীরা সিন্ডিকেট গড়ে বাইরে থেকে ব্যবসায়ীদের আসতে দেয় না। জগদীশ সাউ জানান, দু'বছর আগে রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী বেচারাম মান্না এবং স্থানীয় বিধায়ক সমরেশ দাস বাদামের লাভজনক দাম দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেও আজও তা কার্যকর হয়নি।

এদিন চাষিরা প্রায় একঘণ্টা পথ অবরোধ করেন। চিনাবাদাম চাষি শ্যামাপদ মাইতি, প্রদীপ মাইতি, লঙ্কা চাষি খগেন্দ্রনাথ দাস, মানস পণ্ডা, কৃষ্ণপদ করণ প্রমুখ জানান, কোনও সরকারই কৃষকের ন্যায্য দাম পাওয়ার ব্যবস্থা করেনি। এদিন বিক্ষোভের জেরে চিনাবাদাম ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কৃষক প্রতিনিধিদের বৈঠক ডাকেন এসডিও। কিষানমান্ডিতে বিপণন চালু করা এবং টাস্ক ফোর্স গঠন করে দাম নির্ধারণের প্রতিশ্রুতি তিনি দিয়েছেন।

পাঠকের মতামত

স্পষ্ট দাবি না তুললে সমস্যার সমাধান হবে না

গণদাবী ৭০ বর্ষ ৪৬ সংখ্যায় প্রকাশিত 'মাশুল কমানোর দাবি এড়াতেই লোকসানের গল্প' শীর্ষক সংবাদ প্রসঙ্গে এই চিঠি। বলা হয়েছে, বিদ্যুতে লোকসান কমানোর জন্য মুখ্যসচিবকে একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গঠন করার পরামর্শ দিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। বর্তমানে বিদ্যুৎ মাশুল বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন রকম। সর্বনিম্ন মাশুল গোয়ায়, প্রতি ইউনিট ১.৭০ টাকা এবং সর্বোচ্চ পশ্চিমবঙ্গে ৮.৯৯ টাকা প্রতি ইউনিট। বিদ্যুৎ সংক্রান্ত প্রযুক্তিগত ও অর্থনৈতিক অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আমার মনে হয়, ব্যবহারের পরিমাণ নির্বিশেষে বাস্তবসম্মত বিদ্যুৎ মাশুল হওয়া উচিত ইউনিট প্রতি ৩.৫০ টাকা। মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, ছত্তিশগড়, উত্তরাখণ্ড, বিহার, ঝাড়খণ্ড, গুজরাট ও কেরালায় বিদ্যুৎ মাশুল ইউনিট প্রতি ৩.৫০ টাকার আশপাশে।

আমার মতে, বিদ্যুৎ মাশুলের বর্তমান হার কমাতে হবে— এই দাবির পরিবর্তে অ্যাবেকার পক্ষ থেকে ইউনিট প্রতি ৩.৫০ টাকা বা এই রকম একটি সুনির্দিষ্ট মাশুলের দাবি জানানো প্রয়োজন। মাশুলের এই হার জ্বালানির দামের মতো গোটা দেশে একইরকম হওয়াও দরকার। বিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষ যদি জানায় যে তাদের পক্ষে এই দাবি মানা সম্ভব নয়, তখন তাদের সঙ্গে দর-কষাকষির কথা ভাবা যাবে। এছাড়া, যে সব গ্রাহক মাসে ৪০০ ইউনিটের কম বিদ্যুৎ ব্যবহার করেন, তাঁদের ক্ষেত্রে দিল্লির উদাহরণ অনুসরণ করে সর্বসম্মত অভিন্ন হারের ৫০ শতাংশ মাশুল ধার্য করা উচিত।

প্রসঙ্গত, কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দর-কষাকষির ক্ষেত্রে শ্রমিক সংগঠনগুলি সবসময় সুনির্দিষ্ট মজুরি ও বেতনের দাবি তুলে থাকে। অস্পষ্ট বক্তব্য নয়, সুনির্দিষ্ট দাবি-দাওয়াই সমস্যার সমাধান করতে পারে।

ডঃ সমীর দাশগুপ্ত
সল্টলেক, কলকাতা

গণদাবীর সংযোজন

পত্রলেখকের মূল বক্তব্যের সাথে সহমত পোষণ করে অ্যাবেকার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে, সুনির্দিষ্টভাবেই ৫০ শতাংশ বিদ্যুৎ মাশুল কমানোর দাবি করা হয়েছে, যা প্রকাশিত সংবাদে উল্লেখিত হয়নি। বর্তমানে রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানিতে গড় মাশুল প্রতি ইউনিট ৭ টাকা ১২ পয়সা এবং সিইএসসিতে ৭ টাকা ৩১ পয়সা। বিদ্যুৎ উৎপাদন খরচ কোথায় কোথায় কমেছে এবং ৫০ শতাংশ মাশুল কমানো কেন সম্ভব সেটাও অ্যাবেকার সার্বিক বক্তব্যে আছে, যা সংবাদের উদ্দেশ্যের সাথে সাযুজ্যপূর্ণ নয় বলে এখানে প্রকাশ করা হয়নি। যদিও গণদাবীর অন্যান্য সংখ্যায় এ বিষয়ে লেখা আছে।

প্রসঙ্গত, সাম্প্রতিক অতীতের বছর বছর মাশুল বৃদ্ধির ধারাবাহিকতা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশন গত দু'বছর (২০১৬-১৭, ২০১৭-১৮) বন্ধ করেছে। আন্দোলনের চাপেই এটা সম্ভব হয়েছে। যদিও এখনও মাশুল কমাতে বাধ্য করা যায়নি। এই আন্দোলনে পত্রলেখক সহ সংশ্লিষ্ট সকলের অংশগ্রহণ অ্যাবেকা প্রত্যাশা করে।

দেশের নেতারা সেকুলার কথাটির অর্থই বদলে দিয়েছেন

তিনের পাতার পর

ধারণা, প্রতিদিনের আচরণ ও ধর্মানুষ্ঠানগুলোর প্রতি ক্রমবর্ধমান পৃষ্ঠপোষকতার মধ্য দিয়ে সেকুলারিজম সম্বন্ধে যে ধারণা প্রকাশ পাচ্ছে, তাতে সত্যিই অবাক হতে হয়। এইসব নেতারা মিলে আমাদের দেশে 'সেকুলার স্টেট'-এর মানে যা দাঁড় করিয়েছেন, তাতে যে-কোনও চিন্তাশীল ব্যক্তির মনে স্বাভাবিকভাবেই একটা প্রশ্ন দেখা দেবে। ইসলাম ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করে বলে আমরা পাকিস্তানকে বলব ইসলামিক ধর্মীয় রাষ্ট্র (Islamic theocratic state)। আর যদি সকল ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা ও উৎসাহদানই ভারত রাষ্ট্রের কাজ হয়, তা হলে তাকে একটি বহুধর্মীয় রাষ্ট্র (multi-theocratic state) ছাড়া আর কী বলা চলে?

সেকুলার গণতন্ত্রের, সেকুলার গণতান্ত্রিক জীবনযাত্রার মূল নীতিগুলি কী? সেকুলার ভাবনা-ধারণা বা ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক জীবনযাত্রার মূল নীতিগুলো গড়ে তোলার ব্যাপারে শিক্ষা যে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে— এ কথা বোধকরি কেউ অস্বীকার করবেন না। তা হলে এটাই তো স্বাভাবিক যে, একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে শিক্ষা সবসময় ধর্মীয় মূল্যবোধের বিরুদ্ধে ধর্মনিরপেক্ষ মূল্যবোধগুলোকে তুলে ধরবে। যদি সত্যসত্যই ভারতকে একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের মর্যাদা দিতে চাই তাহলে শিক্ষা ব্যবস্থাকে অবশ্যই ধর্মীয় ভাবধারার প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করতে হবে। কিন্তু আমরা আমাদের এই তথাকথিত সেকুলার রাষ্ট্রে বাস্তবে কী দেখছি? শিক্ষাব্যবস্থাকে ধর্মীয় প্রভাব থেকে মুক্ত করা তো দূরের কথা, শিক্ষা ব্যবস্থায় ধর্মীয় প্রভাব, শিক্ষানুষ্ঠানগুলিতে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের আধিক্য, এমনকী পাঠ্যপুস্তকগুলিতে ধর্মীয় প্রচার দিনের পর দিন ক্রমেই বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। তাই শিক্ষাপদ্ধতি ও শিক্ষাব্যবস্থার গণতন্ত্রীকরণের দাবিতে যাঁরা আজ আন্দোলন পরিচালনা করছেন, তাঁদের প্রথমেই দুটো জিনিস পরিষ্কার করে বুঝতে হবে। প্রথমত শিক্ষাকে ধর্মীয় ভাবধারা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করতে হবে। দ্বিতীয়ত শিক্ষা সংস্কারের দৃষ্টিভঙ্গি— পুঁজিবাদী শোষণ থেকে মুক্তির জন্য শ্রমিক শ্রেণি ও অন্যান্য শোষিত জনসাধারণের প্রতিদিন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে যে লড়াই চলছে, তার পরিপূরক কি না বিচার করে দেখতে হবে। এ দু'টি মাপকাঠির ভিত্তিতেই শিক্ষা সংস্কার ও শিক্ষাব্যবস্থার গণতন্ত্রীকরণের উদ্দেশ্যে পরিচালিত কোনও একটি আন্দোলন প্রগতিশীল কি প্রতিক্রিয়াশীল— তা বিচার করে দেখতে হবে। আমাদের দেশে শিক্ষার সংস্কার নিয়ে বহু কমিশন বসেছে। এই সব কমিশনগুলো শিক্ষা ব্যবস্থার নানা খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে পাতার পর পাতা সুপারিশে ভর্তি করে ফেলেছে। কিন্তু সমস্যাটির আসল জায়গায় ঘা দেওয়া এদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। তাই আজ দেশের অভ্যন্তরে নৈতিকতার অধঃপতনের আসল কারণটি নেতারা কেউই ঠিকমতো ধরতে পারছেন না। বহু চিন্তাশীল ব্যক্তি ও অনেক রাজনৈতিক নেতার ধারণা, আমরা সব ঠিকমতো আচরণ করছি না, তাই এরকম কাণ্ড হচ্ছে। যাঁরা সৎ, যাঁরা সত্যিই সমস্যাটা ধরবার চেষ্টা করছেন, যাঁরা ভাবছেন মানুষগুলো ঠিকমতো আচরণ করছে না, ব্যক্তিগত আচরণবিধি নেই,— সত্যিই নেই— রাজনীতিতে নেই, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নেই, প্রশাসনে নেই, আমি তাঁদের একটা কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। এটা যে নেই একথা সবাই অনুভব করছেন, আমরাও করছি। কিন্তু নেই কেন? এই তো সেদিন স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় তোমরা নেতারা ছাত্রদের বলেছিলে, 'ফ্লাওয়ার্স অব বেঙ্গল'।

তারা দলে দলে 'কেরিয়ার' ছেড়ে, কোনও পিছু ডাকে কান না দিয়ে, তাদের সর্বস্ব ত্যাগ করে রাজনৈতিক আন্দোলনে দেশের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। মাস্টারমশাইদের সেদিন আদর্শ পুরুষ মনে করত ছাত্ররা। আজকে তাঁদের মনে করে না কেন? সেইসব ছাত্র কোথায় হারিয়ে গেল? তাহলে কি এ কথাই মানতে হবে, তখন ঈশ্বর আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন, তাই আমাদের সব ঘরে ঘরে সুপুত্র পাঠাতেন, এখন আমাদের প্রতি বিগড়ে গেছেন কাজেই বেছে বেছে যত কুপুত্র আমাদের ঘরে ঘরে পাঠাচ্ছেন? আপনারা নিশ্চয়ই কেউ এভাবে ভাবেন না। তা হলে গোটা দেশের মানসিকতা বিগড়ে গেল কী করে? নৈতিকতার মান ক্রমাগত নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে কেন? আমরা তো নৈতিকতার মান বাড়াতেই চাইছি। আমরা তো বলছি, দেশকে রক্ষা কর, পরিশ্রম কর, সৎ হও। কিন্তু, যত বলছি সৎ হও, পরিশ্রম কর, তত মানুষ মোটা অর্থে প্রয়োজনবাদী হয়ে পড়ছে।

(২৬ মে, ১৯৬৯)

ঠিকানা খোলা মাঠ, তবু 'শ্রেষ্ঠ' জিও বিশ্ববিদ্যালয়!

একের পাতার পর

বেছে নিয়ে উৎকর্ষ কেন্দ্র হিসাবে তুলে ধরতে। সেই কমিটি তিনটি সরকারি ও দুটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে আম্বানিদের এখনও তৈরি না হওয়া 'জিও বিশ্ববিদ্যালয়'কে বেছে নিয়েছে প্রথম ৬টি শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অন্যতম হিসাবে।

জানা গেছে, যে প্রতিষ্ঠানগুলিকে কমিটি উৎকর্ষতার স্ট্যাম্প দেবে তাদের 'পূর্ণ স্বাধিকার' দেবে সরকার। অর্থাৎ যথেচ্ছ ফি নেওয়া থেকে শুরু করে যথেচ্ছভাবে বিদেশি ছাত্রদের ভর্তি নেওয়া, কোর্সের সময়কাল, সাবজেক্ট কম্বিনেশন, শিক্ষকদের বেতনের পরিমাণ, তাঁদের যোগ্যতার মান সহ সবকিছুই বেসরকারি কর্তারা একতরফাভাবে ঠিক করতে পারবেন। সেখানে ছাত্ররা কিছু শিখুক- না শিখুক, টাকাটাই হবে মুখ্য বিষয়, সরকার হস্তক্ষেপ করবে না। আসলে শিক্ষার উৎকর্ষতা যাচাইয়ের নামে কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ করলে কত লাভ উঠবে তা দেখারই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এই এক্সপার্ট কমিটিকে। মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক বলেই দিয়েছে সারা বিশ্বের 'দায়িত্বশীল বিনিয়োগকারীরা' যাতে ভারতের শিক্ষা ক্ষেত্রে পুঁজি বিনিয়োগ করে তার জন্যই এই 'শ্রেষ্ঠত্ব' যাচাই। সেই কারণেই এই কমিটির মাথায় মোদি সরকার বসিয়েছে কোনও শিক্ষাবিদকে নয়, একজন আমলাকে। সরকারি এই এক্সপার্ট কমিটির ব্যাখ্যা অনুযায়ী উৎকর্ষের মানে দাঁড়িয়েছে উঁচু মানের পড়াশোনা-গবেষণা নয়, দেশি-বিদেশি নানা প্রতিষ্ঠানের সাথে গাঁটছড়া বেঁধে নামী-দামি স্ট্যাম্পের জোরে সার্টিফিকেটের দাম বাড়ানো। উৎকর্ষতার এই স্ট্যাম্প আসলে শিক্ষা ব্যবসার বিজ্ঞাপন। আর বেসরকারি এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলির হয়ে বিশ্বজুড়ে এই বিজ্ঞাপনের দায়িত্বটি নিয়েছে মোদি সরকার।

জিও বিশ্ববিদ্যালয়কে বলা হচ্ছে 'গ্রিনফিল্ড ইউনিভার্সিটি'। অর্থাৎ সবুজ মাঠের বিশ্ববিদ্যালয়। তৈরি হওয়ার আগেই এর মালিককে কম সুদে ব্যাঙ্ক টাকা ধার দেবে। যদি বিশ্ববিদ্যালয় আদৌ তৈরি না হয়, ব্যাঙ্কের ধার শোধের কী হবে? অসুবিধা নেই, ব্যাঙ্কঋণ ফাঁকির নায়ক নীরব মোদি কিংবা বিজয় মালিয়ার পাশে থাকা বিজেপি সরকার কি আর তখন আম্বানিদের পাশে দাঁড়াবে না? লোভে লোভে এয়ারটেল কোম্পানি, বেদান্ত গোষ্ঠীর মতো নানা শিল্পপতি গোষ্ঠীও গ্রিনফিল্ড ইউনিভার্সিটি তৈরির লাইনে রয়েছে। এরা সবাই একখণ্ড করে জমি দেখিয়েই বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবি করছে। তারাও উৎকর্ষের স্ট্যাম্প পকেটে পুরল বলে!

২০০০ সালে অটল বিহারী বাজপেয়ীর আমলে শিক্ষার দিশা নির্ধারণের জন্য বিজেপি সরকার যে শিক্ষা কমিশন গঠন করেছিল তার আহ্বায়ক ছিলেন রিলায়েন্সের মালিক মুকেশ আম্বানি এবং সদস্য ছিলেন শিল্পপতি কুমারমঙ্গলম বিড়লা। তাঁরা সুপারিশ করেছিলেন, সরকার উচ্চশিক্ষাকে পুরোপুরি বেসরকারি মালিকদের হাতে ছেড়ে দিক। বলেছিলেন, সরকারি প্রতিষ্ঠানে এমনভাবে ফি বাড়াতে হবে যাতে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে তা সমান হয়ে যায়। কারণ, একেবারে সাধারণ মানুষও সন্তানকে পড়াতে চায়। সেই মানসিকতাকে কাজে লাগিয়ে শিক্ষা নিয়ে ব্যবসার জায়গা করে দিতে হবে পুঁজিপতিদের জন্য। কমিটি নিশ্চিত করে বলেছিল, কারখানা না চলতে পারে, কিন্তু শিক্ষা ব্যবসায় মুনাফার অভাব হবে না।

রাজীব গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস সরকার এর আগেই 'জাতীয় শিক্ষানীতি ১৯৮৬'-তে শিক্ষাকে বিনিয়োগের প্রশস্ত ক্ষেত্র হিসাবে দেখায়। তারা প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়, ডিমড ইউনিভার্সিটি ইত্যাদির মাধ্যমে পুঁজিপতিদের লাভের বন্দোবস্তও করে দেয়। বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে পড়ে কেবল মাত্র সার্টিফিকেট বেচার জায়গা। দেখা যায় কিছুদিনের মধ্যেই রাজ্যে রাজ্যে ব্যাঙের ছাতার মতো বিশ্ববিদ্যালয় গজিয়ে উঠেছে। দেখা যায়, পানের দোকানেও ঝুলছে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাইনবোর্ড। নরেন্দ্র মোদি সরকারের তত্ত্বাবধানে গ্রিনফিল্ড ইউনিভার্সিটির এই রমরমা সাধারণ ঘরের ছাত্রছাত্রীদের কাছে সেরকমই নির্মম রসিকতা হিসাবে এসেছে।

বিশ্ববিদ্যালয় হল জ্ঞানচর্চার পীঠস্থান। সরকার কিংবা পুঁজিমালিকদের শাসনের বেড়ি থেকে মুক্ত স্বাধীন চিন্তার পরিসর। কর্পোরেট পুঁজির ব্র্যান্ডওয়ালা বিল্ডিং তৈরি করে আর ম্যানেজমেন্টের লোক বসিয়ে কখনও জ্ঞানচর্চার এ হেন কেন্দ্র গড়ে তোলা যায় না। শিক্ষাকে পুঁজিপতিদের মুনাফা শিকারের ক্ষেত্রে পরিণত করতে গিয়ে তাদের সেবাদাস বিজেপি-কংগ্রেসের মতো দল এভাবেই আজ শিক্ষার সর্বনাশ করছে। এর ফলে শুধু কিছু সাময়িক ক্ষতি নয়, বিরাট ক্ষতি হচ্ছে আগামী প্রজন্ম এবং সমগ্র মানব জাতির। বিজেপি সরকারের এমন সর্বনাশা ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো আজ অবশ্যকর্তব্য।

‘মন কি বাত’

চাষিকে দিয়ে বলানো হল শেখানো বুলি

জনশ্রুতি, হজরত মহম্মদের এক উত্তরসূরি সুলতান মহম্মদ উমর তাঁর প্রজারা কেমন আছেন দেখার জন্য রাত্রিবেলা ছদ্মবেশে নগরীতে ঘুরতেন। তাঁদের সুবিধা-অসুবিধা নিজ চোখে দেখে সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতেন। এঁদের বলা হত প্রজাবৎসল। কিন্তু ভারতের বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর আচরণে প্রজাবাৎসল্যের চিহ্নমাত্র নেই। তিনি তাঁর প্রজাদের দুরবস্থা নানা কৌশলে ঢেকে রাখতে চান। প্রজাদের ভাল রাখার থেকে তারা ভাল আছে দেখানোতে তাঁর আগ্রহ বেশি। তার জন্য আয়োজনও অঢেল। তেমনই একটি আয়োজন প্রধানমন্ত্রীর ‘মন কি বাত’।

রেডিও এবং টিভিতে প্রচারিত এই অনুষ্ঠানটিতে প্রধানমন্ত্রীই বলেন বেশি, প্রজাদের কথা শোনেন কম। যদি বা কখনও শোনেন তা প্রজাদের মনের কথা নয়, প্রজাদের মুখ দিয়ে বলানো তাঁর নিজেরই শুনতে চাওয়া রঙ চড়ানো, বানানো কথা। এই যেমন ছত্তীসগঢ়ের গরিব চাষি চন্দ্রমণি কৌশিকের কথাই ধরুন। ওই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, চাষ করে তাঁর আয় বেড়েছে কি না? উত্তরে তিনি জানান, হ্যাঁ বেড়েছে। এর দ্বারা সারা দেশের মানুষকে বোঝানো গেল, চাষিরা কত ভাল আছে।

এ পর্যন্ত সব ঠিকঠাকই ছিল। কিন্তু সমস্যা বাধল অন্য জায়গায়। দিল্লির এক টিভি চ্যানেলের প্রতিনিধি পৌঁছে যান ওই কৃষক রমণীর কাছে। তাতেই ঝুলি থেকে বিড়াল বেরিয়ে এল। চন্দ্রমণি ওই সাংবাদিককে জানান, তাঁর আয় বাড়েনি। তা হলে তিনি এমন কথা বললেন কেন প্রধানমন্ত্রীকে? উত্তরে তিনি বলেন, ওই অনুষ্ঠানের আগে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের কর্মীরা তাঁর বাড়ি এসে তাঁকে শিখিয়ে দেন ফোন করে প্রধানমন্ত্রীকে কী বলতে হবে। তিনি তাই বলেছেন।

স্বাভাবিক ভাবেই বিজেপি এর বিরোধিতা করেছে। তাঁদের বক্তব্য, ধান চাষে তাঁর আয় বাড়েনি— ওই মহিলা এ কথা ওই চ্যানেলকে বললেও আতা চাষে যে তাঁর আয় বেড়েছে সে কথাও বলেছিলেন। চ্যানেলটি নাকি সে কথা প্রকাশ করেনি। আতা চাষে চন্দ্রমণির আয় যদি সামান্য কিছু বেড়েও থাকে, মোদিজির মন কি বাতে কারও কারও গলায় আচ্ছে দিনের জয়গান যে আসলে আগে থেকে শিখিয়ে-পড়িয়ে রাখা কিছু মিথ্যে বুলিমাত্র— এ ঘটনায় তা দিনের আলোর মতো পরিষ্কার।

স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন ওঠে, এমন করে শিখিয়ে দেওয়ার দরকার কী? সরাসরি সত্যিটা জানলে অসুবিধা কোথায়? আসলে, না শেখালে দেশজুড়ে প্রচারিত এই অনুষ্ঠানে সাধারণ মানুষের মনের আসল কথাটি বেরিয়ে এসে বিজেপির আচ্ছে দিনের হাঁড়ি ভরা-হাটে ভেঙে দেবে। এইখানেই প্রধানমন্ত্রীর ভয়।

গত লোকসভা নির্বাচনের আগে প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁর দল বিজেপির প্রতিশ্রুতি ছিল, বছরে দু’কোটি বেকারের চাকরি। সরকারি হিসেব বলছে, বছরে দু’লক্ষ চাকরির কথা স্বীকার করতেও এখন সরকারি আমলাদের জিভে আটকাচ্ছে। সম্প্রতি রেলের প্রায় ৯০ হাজার পদের জন্য আবেদন করেছেন আড়াই কোটিরও বেশি জন। উত্তরপ্রদেশে সরকারি অফিসে ৩৬৬টি পিওনের পদে আবেদন জমা পড়েছে ২৩ লক্ষ। তার মধ্যে ২৫৫ জন পিএইচডি, ২ লক্ষের বেশি ইঞ্জিনিয়ার। প্রধানমন্ত্রী চাকরি চেয়ে সময় নষ্ট না করে দেশের বেকারদের পকোড়া ভেজে আয় করতে পরামর্শ দেন। সামনেই কয়েকটি রাজ্য এবং লোকসভার নির্বাচন। দেশজোড়া লাগাতার কৃষক বিক্ষোভে জেরবার বিজেপি সরকার কৃষকদের ক্ষোভকে স্তিমিত করতে বেশ কিছু ফসলের সহায়ক মূল্য কিছুটা বাড়ানোর কথা ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছে। এই যৎসামান্য সহায়তাও কৃষকরা কবে পাবেন বা আদৌ পাবেন কি না, তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। কারণ শুধু ঘোষণা করলেই চাষিরা সহায়ক মূল্য পাবেন না। টাকা বরাদ্দ করতে হবে, তা পাওয়ার পরিকাঠামো গড়ে তুলতে হবে। সে উদ্যোগ কোথায়? ক্ষমতায় এসে একশো দিনে কালো টাকা উদ্ধার করে সবার অ্যাকাউন্টে ১৫ লক্ষ করে টাকা জমা করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন মোদি। নোট বাতিল করে বলেছিলেন, কালো টাকার মালিকরা আর রেহাই পাবে না। সম্প্রতি সুইস ব্যাঙ্কের দেওয়া তথ্যে দেখা যাচ্ছে, নোট বাতিলের পরে শুধু ২০১৭ সালেই সুইস ব্যাঙ্কে ভারতীয়দের জমা করা কালো টাকার পরিমাণ ৫০ শতাংশ বেড়ে গেছে। লাগামছাড়া মূল্যবৃদ্ধি মানুষের জীবনকে জেরবার করে দিচ্ছে। লে-অফ, লক-আউট, ছাঁটাই শ্রমিকদের জীবন তছনছ করে দিচ্ছে। মহিলাদের উপর নির্যাতন, খুন, ধর্ষণ অতীতের সমস্ত রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে। সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে এই ব্যর্থতার কথা প্রধানমন্ত্রী কিংবা তাঁর দলের নেতাদের অজানা নয়। এই অবস্থায় সাধারণ মানুষের মনের কথা শুনে সত্যের মুখোমুখি হওয়ার সাহস কি প্রধানমন্ত্রী দেখাতে পারেন! তাই শেখানো বুলি বলানোর ব্যবস্থা!

ছাত্র সংসদ তোলাবাজির জায়গা নয়

ছাত্র ও শিক্ষা স্বার্থে সংগ্রামের হাতিয়ার

পাশ করলেই ভর্তি হওয়া যাবে না। বেশি নম্বর পেলেও নয়। তোলাবাজদের খুশি করার মতো টাকা থাকা চাই। তার পরিমাণটা ৩০ হাজার, ৪০ হাজার, ৫০ হাজার— কোথাও কোথাও ৮০ হাজার বা তারও বেশি। এটা দিতে হবে ইউনিয়নের দাদাদের। এমন অলিখিত ফরমান রাজ্যের কলেজগুলিতে বহু স্বপ্ন নিয়ে ভর্তি হতে আসা ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ত্রাসের সৃষ্টি করেছে। এ কেমন ছাত্র ইউনিয়ন, যা ছাত্র স্বার্থরক্ষার দায়বদ্ধতা, নীতি-আদর্শ বিসর্জন দিয়ে নির্লজ্জ তোলাবাজির সিন্ডিকেটে পরিণত হয়েছে!

পরাধীন ভারতে ছাত্র স্বার্থরক্ষার জন্য ছাত্র ইউনিয়ন তথা ছাত্র রাজনীতির শুরু। সেই আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু। বিদেশি পণ্য বর্জন, মাদক বিরোধী আন্দোলন, এমনকী বিপ্লবী আন্দোলনেও ছাত্রদের অংশগ্রহণ সেদিন ছিল উল্লেখযোগ্য। মাস্টারদার নেতৃত্বে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখলের কর্মসূচিতে অংশ নেওয়া বিপ্লবীদের অনেকেই ছিলেন ছাত্র। সুভাষচন্দ্র নিজে স্কুলে পড়াকালীনই বিপ্লবী ক্ষুদিরামের শহিদ দিবস পালন করেছিলেন। রাইটার্স অভিযানে অংশ নিয়ে ফাঁসিতে প্রাণ দেওয়া বিপ্লবী বিনয় বোস ছিলেন ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্র। এমন আরও অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে।

ক্ষমতা হস্তান্তরের পর যখন কংগ্রেস এ দেশের পুঁজিপতি শ্রেণির স্বার্থরক্ষার লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য নিয়ে শাসন ক্ষমতায় বসল তখন থেকেই তাদের অনুগামী ছাত্র সংগঠনও ছাত্র স্বার্থরক্ষার পরিবর্তে সরকারের শিক্ষা সংকোচন নীতির পক্ষে গিয়ে দাঁড়াল। তখন থেকেই ছাত্র রাজনীতির মূল ধারাটির অধঃপতন শুরু। ষাটের দশকের গোড়াতে শাসক কংগ্রেস আসন সংকোচন নীতি ঘোষণা করে। সরকার অনুগামী সংগঠন ছাত্র পরিষদ তা নিয়ে টুঁ শব্দ করেনি। ষাটের দশকের শেষ লগ্নে এ রাজ্যে গণটোকাটুকির কথা নিশ্চয়ই প্রবীণদের মনে আছে। ছাত্রদের মধ্যে সস্তায় প্রিয় হওয়ার প্রতিযোগিতায় বামপন্থার নাম নেওয়া ছাত্র ফেডারেশন এবং ছাত্রপরিষদ গণটোকাটুকিতে সংগঠনগত ভাবে মদত দেয়। যে ’৭২-এর সন্ত্রাসের কথা, কংগ্রেসি জমানার আধাফ্যাসিস্ট সন্ত্রাসের কথা ইতিহাস হয়ে রয়েছে, সেই সন্ত্রাসী বাহিনীর অন্যতম ছিল ছাত্রপরিষদ কর্মীরা। ’৭৭-এর নির্বাচনে কংগ্রেসের পরাজয়ের পর বামফ্রন্ট জমানায় ছাত্র ইউনিয়নগুলি রাতারাতি চলে যায় সিপিএম অনুগামী এসএফআইয়ের দখলে। এসএফআই-ও ছাত্রদের মধ্যে যুক্তি-বুদ্ধির চর্চার পরিবর্তে ছাত্রপরিষদের মতো যে কোনও ভাবে হোক ছাত্রসংসদ দখলের পথ নেয়। বামফ্রন্টকে ‘চোখের মণির মতো রক্ষা’ করার নামে সরকারের ছাত্র স্বার্থবিরোধী, জনবিরোধী শিক্ষানীতির হয়ে ওকালতি করাই হয়ে দাঁড়ায় তাদের একমাত্র কাজ। সিপিএম সরকারের শিক্ষানীতি, বিশেষ করে প্রাথমিক স্তরে ইংরেজি তুলে দেওয়া, পাশফেল তুলে দেওয়া, স্কুল কলেজে লাগাতার ফি বাড়ানো, শিক্ষার বেসরকারিকরণ, বাণিজ্যিকীকরণ প্রভৃতি ছাত্রস্বার্থবিরোধী নীতিগুলি নিয়ে এস এফ আই পরিচালিত ইউনিয়নগুলি কোনও বিতর্কই কোনও দিন তোলেনি। এই অন্ধ দৃষ্টিভঙ্গির জন্য কলেজে কলেজে তারা ছাত্রস্বার্থ বিরোধী শক্তি হিসাবে পরিচিতি লাভ করে।

সিপিএমের বিরুদ্ধে রাজ্যের জনগণের প্রবল ক্ষোভকে পুঁজি করে ২০১১ সালে ক্ষমতায় এল তৃণমূল কংগ্রেস। কলেজে কলেজে ছাত্র রাজনীতির দখল নিল তারা। এই সংগঠনেরও একমাত্র লক্ষ্য হয়ে গেল ছাত্র ইউনিয়নের মধুভাণ্ডের দখলদারি চালানো এবং ছাত্রদের উপর দাদাগিরি ফলানো। এখন কলেজে কলেজে তোলাবাজ হিসাবে তাদের কথাই প্রতিদিন সংবাদমাধ্যমে উঠে আসছে।

প্রশ্ন উঠতে পারে, শাসক দলগুলি এসবে প্রশ্রয় দেয় কেন? দেয়, তার কারণ নীতি-আদর্শহীন রাজনীতির কারবারি এইসব দলের নেতাদের কাছে এই নগদ ‘তোলার’ বখরা যায়। তা ছাড়া এভাবে ছাত্র ইউনিয়নগুলিকে দখলে রাখতে পারলে ভোটরাজনীতিতেও সুবিধা মেলে। এই অধঃপতিত রাজনীতি আজ ছাত্রদের সামনে মারাত্মক বিপদ হিসাবে দেখা দিয়েছে। যে ছাত্র রাজনীতি একদিন দেশের ছাত্রদের চরিত্র দিয়েছে, মনুষ্যত্ব দিয়েছে, তা আজ শাসক দলগুলির নীতিহীন রাজনীতির হাতে পড়ে এসবের চিহ্নমাত্র রাখছে না।

ছাত্র রাজনীতির এই অধঃপতিত রূপটিকে দেখে কিছু অভিভাবক ছাত্র রাজনীতি সম্পর্কেই বিরূপ হয়ে উঠেছেন। তাঁরা চান না তাঁদের সন্তানরা ছাত্র রাজনীতিতে যুক্ত হোক। আবার এক শ্রেণির ধুরন্ধর রাজনীতিক এটিকে দেখিয়ে ছাত্র রাজনীতি বা ছাত্র ইউনিয়ন নিষিদ্ধ করার দাবি করেছেন। অথচ ছাত্ররাজনীতির এই নষ্ট ধারাটিই সব নয়। আশার কথা, সংবাদমাধ্যমের প্রচারের আড়ালে থেকেও এর বিপরীত ধারার একটি শক্তিশালী ছাত্র রাজনীতিও রয়েছে, যা দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষা ও ছাত্রস্বার্থে নিরলসভাবে আপসহীন লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। সে লড়াই হল, এ যুগের শ্রেষ্ঠ মার্কসবাদী দার্শনিক ও চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের আদর্শে অনুপ্রাণিত এ আই ডি এস ও-র (অল ইন্ডিয়া ডেমোক্রেটিক স্টুডেন্টস অর্গানাইজেশন) লাগাতার আন্দোলন। কমরেড শিবদাস ঘোষ বলতেন, রাজনীতিতে চরিত্র চাই। বলতেন, রাজনীতি একটা উচ্চ হৃদয়বৃত্তি। বিপ্লবী রাজনীতি উচ্চতর হৃদয়বৃত্তি। এআইডিএসও সূচনাকাল থেকেই কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষায় নীতি এবং আদর্শকে ভিত্তি করে সরকারের একের পর এক ছাত্রস্বার্থ বিরোধী শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে লাগাতার লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে।

ছয়ের দশকের শুরুতে কংগ্রেস সরকারের আসন সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনার বিরুদ্ধে একমাত্র এআইডিএসও-ই আন্দোলন গড়ে তুলেছিল। গণটোকাটুকির বিরুদ্ধেও সোচ্চার হয়েছিল এই সংগঠনটিই। এ রাজ্যে সিপিএম সরকার ক্ষমতায় বসে প্রথমেই প্রাথমিক স্তর থেকে ইংরেজি ও পাশফেল তুলে দেয়। প্রতিবাদে রাজ্য জুড়ে ছাত্র আন্দোলন গড়ে তোলে ডিএসও। টানা উনিশ বছর আন্দোলনের পরিণতিতে ইংরেজি ফেরাতে যে বাধ্য হয়েছে সিপিএম সরকার তাতে ডিএসও-র ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পাশ-ফেলের দাবিতে আন্দোলন আজও চলছে। ফি বাড়ানো, ডোনেশন, বেসরকারিকরণ প্রভৃতি আক্রমণের বিরুদ্ধেও ডিএসও নিরলস আন্দোলন গড়ে তুলেছে। বহু ক্ষেত্রে দাবি আদায় করতে সমর্থও হয়েছে। পাশাপাশি ছাত্রদের চরিত্র গড়ে তুলতে নবজাগরণ এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের মনীষী ও বিপ্লবীদের জীবন ও সংগ্রামকে ভিত্তি করে সাংস্কৃতিক আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। উন্নত রুচি ও সংস্কৃতির আধারে গড়ে ওঠা এই আন্দোলনে ছাত্ররা আকৃষ্ট হচ্ছে। অন্ধকারের পাশাপাশি আশার এই উজ্জ্বল আলোটি ক্রমাগত শক্তি অর্জন করছে।

ব্লাড ডোনার্স কার্ড তুলে দেওয়ার প্রতিবাদ

৭ জুলাই মালদা মেডিকেল কলেজ আয়োজিত আলোচনা সভায় ব্লাড ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ জানান, আগামীদিনে ডোনার্স কার্ড তুলে দেওয়া হবে। সভায় উপস্থিত মনীষী স্মরণ কমিটি ও মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের প্রতিনিধিরা এই ঘোষণার তীব্র বিরোধিতা করেন। তাঁরা বলেন, এর ফলে স্বেচ্ছায় রক্তদানে দাতারা আগ্রহ হারাবেন। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের পরামর্শদাতা কমিটি সিদ্ধান্ত নিয়েছে ব্লাড ব্যাঙ্কের নাম পরিবর্তন করে ‘ব্লাড সেন্টার’ করা হবে। প্রতিনিধিদের প্রশ্ন, নাম পরিবর্তনে রোগী বা রোগীর পরিজনদের রক্তের জন্য হয়রানি বন্ধ হবে কি?

R.N.I. No 5268 / 60
P.R. No. KOL RMS/138/2016-18

বিদ্যুৎ মাশুল কমানোর দাবিতে রাজ্য জুড়ে বিক্ষোভ

দিনহাটা, কোচবিহার

কলকাতা, সিইএসসি দপ্তর

কার্জন গেট, বর্ধমান

কয়লার দাম ৪০ শতাংশ কমেছে, জি এস টি হয়েছে ৭ শতাংশ, তার উপর কোম্পানিগুলির বাণিজ্যিক ও কারিগরি ক্ষতি কমেছে ২ শতাংশ। এতে বিগত ২ বছরে সাশ্রয় হয়েছে ৮,৫৩৯.১৪ কোটি টাকা। ফলে বর্তমান মাশুল কমানোর মাধ্যমে অতি সহজেই এই টাকা গ্রাহকদের ফেরত দেওয়া যেত। কিন্তু নিয়ন্ত্রণ কমিশন তা না করে ২০১৭-'১৮-র মাশুল একই রেখে দেওয়ার ঘোষণা করেছে। ভাবখানা এমন, যেন তারা মাশুল বাড়ালো না। কিন্তু আসলে বর্তমানের অত্যধিক মাশুল বজায় রেখে তারা কৌশলে সেই টাকা মালিকদের হাতেই তুলে দিল।

গ্রাহকদের এইভাবে প্রতারিত করার তীব্র নিন্দা করে ১০ জুলাই কলকাতার গ্রাহক সমাবেশে অ্যাবেকার সাধারণ সম্পাদক প্রদ্যুৎ চৌধুরী মাশুল কমানোর দাবিতে রাজ্য জুড়ে আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। ১০ জুলাই সারা বাংলা প্রতিবাদ দিবসে কলকাতায় সিইএসসি-র সদর দপ্তরে এই বিক্ষোভ সমাবেশে এ ছাড়াও বক্তব্য রাখেন অ্যাবেকার সহ সভাপতি অনুকূল ভদ্র, কলকাতা জেলা সম্পাদক সুশান্ত পাত্র, দীপু গুপ্ত প্রমুখ।

একইভাবে দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, হুগলী, উত্তর ২৪ পরগণা, বাঁকুড়া, মালদহ, বর্ধমান, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ সহ সমস্ত জেলায় বিদ্যুৎ অফিসের সামনে কমিশনের ঘোষণাপত্র পুড়িয়ে বিক্ষোভ, ডেপুটেশন, অবরোধ, প্রতিবাদ সভার মধ্য দিয়ে দিনটি পালন করা হয়েছে।

অস্বাভাবিক ভাড়া বৃদ্ধি ঃ অবরোধ প্যাসেঞ্জার্স ফোরামের

অস্বাভাবিক বাসভাড়া বৃদ্ধি, দূরত্বে কারচুপির বিরুদ্ধে ১৫ জুলাই উত্তর ২৪ পরগণার স্বরূপনগরে প্যাসেঞ্জার্স ফোরামের ডাকে সামিল হন শতাধিক নিত্যযাত্রী সহ শত শত সাধারণ মানুষ। তাঁরা সকাল ১১টা থেকে বেলা দেড়টা পর্যন্ত অবরোধ করেন। বক্তব্য রাখেন ফোরামের সাধারণ সম্পাদক মৃদুল অধিকারী, সভাপতি জগদীশ বাছার, খালেক পাড় প্রমুখ। বক্তারা তাঁদের বক্তব্যে টিকিটপিছু ৫-৮ টাকা বৃদ্ধির জন্য আরটিএ-র সাথে মালিকদের অশুভ বোঝাপড়া ও কোলকাতার সাথে গ্রামাঞ্চলের বৈষম্যমূলক সরকারি ভাড়ানীতিকে দায়ী করেন। সমাধানে সংশ্লিষ্ট সকলকে নিয়ে আলোচনার প্রশাসনিক আশ্বাসে অবরোধ ওঠে। এই আন্দোলন এলাকায় ব্যাপক সাড়া ফেলে।

ভাড়া বৈষম্যের প্রতিবাদ মেদিনীপুরে

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় ব্যাপক বাসভাড়া বৃদ্ধি, ভাড়ায় বৈষম্য, দূরত্বের কারচুপি, ছাত্র কনশেসন না দেওয়ার প্রতিবাদে ১২ জুলাই মেদিনীপুর শহরে এস ডি ও এবং আর টি এ-র কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। জেলাশাসক দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ হয়। এস ডি ও-র কাছে ডেপুটেশন দেন কমরেড প্রভঞ্জন জানা। আর টি এ-কে ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন কমরেড দীপক পাত্র।

নির্ভয়া মামলায় সুপ্রিম কোর্টের রায়কে স্বাগত জানাল এমএসএস

এ আই এম এস এস-এর সর্বভারতীয় কমিটির পক্ষ থেকে ১০ জুলাই এক বিবৃতিতে নির্ভয়া ধর্ষণ ও হত্যাকাণ্ড মামলায় অভিযুক্ত তিন আসামীর মৃত্যুদণ্ড বহাল রাখার সুপ্রিম কোর্টের রায়কে স্বাগত জানানো হয়েছে। দেশজুড়ে মহিলা ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা যখন উদ্বেগজনক ভাবে বেড়ে চলেছে, তখন সুপ্রিম কোর্টের এই রায় নিঃসন্দেহে এতে বাধা হিসাবে কাজ করবে বলে অভিমত প্রকাশ করেছে সংগঠন।

ত্রিপুরায় মাধ্যমিকে পাশের হার ৬০ শতাংশেরও কম

পাশ-ফেল তোলাকে দায়ী করলেন পর্ষদ সভাপতি

এ বছর ত্রিপুরায় মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাশ করেছে মাত্র ৫৯.৫৯ শতাংশ ছাত্রছাত্রী, যা গত বছরের তুলনায় ৭.৭৯ শতাংশ কম। পরিস্থিতি এত ভয়াবহ যে, বহু স্কুলে একজন ছাত্রও পাশ করেনি। কেন এই বিপর্যয়, সে প্রসঙ্গে ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি ১২ জুন সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, পাশ-ফেল না থাকার জন্যই শিক্ষার মান নেমে গিয়েছে।

ছাত্র সংগঠন এ আই ডি এস ও-র ত্রিপুরা রাজ্য সম্পাদক কমরেড মৃদুলকান্তি সরকার ক্ষোভের সাথে বলেন, আমরা বহুদিন ধরেই বলে আসছি পাশ-ফেল না থাকায় শিক্ষার ভিত দুর্বলই থেকে যাচ্ছে। এ নিয়ে আমরা লাগাতার আন্দোলন করে যাচ্ছি। কিন্তু সরকার এখনও পাশ- ফেল চালু করছে না। টালবাহানা করে লক্ষ লক্ষ ছাত্রছাত্রীর শিক্ষাজীবনের মারাত্মক ক্ষতি করছে।

২০০৯ সালে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউ পি এ সরকার অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাশ- ফেল প্রথা তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। সেই সিদ্ধান্ত ত্রিপুরায় কার্যকর করে পূর্বতন সিপিএম সরকার। যদিও পশ্চিমবঙ্গে সিপিএম সরকারই প্রথম শ্রেণি থেকে চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত পাশ-ফেল তুলে দেওয়ার কারিগর। কেন্দ্রের বিজেপি সরকার আন্দোলনের চাপে, নানা কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে পাশ-ফেল ফেরানোর জন্য এই জুলাইতেই সংসদে বিল আনার কথা ঘোষণা করেছে। কিন্তু ডি এস ও-র দাবি শুধু দুটো ক্লাসে (পঞ্চম ও অষ্টম) নয়, প্রথম থেকে অষ্টম প্রতিটি ক্লাসেই পাশ-ফেল ফেরাতে হবে। তা না হলে শিক্ষার এই অবনমন রোখা যাবে না। ১৪ জুন ডিএসও ত্রিপুরা শিক্ষাভবনের সামনে পাশ-ফেল ফেরানোর দাবিতে বিক্ষোভ দেখায়।

ট্রেন বাড়ানোর দাবিতে কাটোয়া স্টেশন ম্যানেজারকে ডেপুটেশন

পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়া রেল স্টেশনে কাটোয়া-বর্ধমান ও কাটোয়া-আমোদপুর রেল লাইনে ন্যূনতম ৬ জোড়া ট্রেন চালু ও ৭ নম্বর প্ল্যাটফর্মে নির্মিত নতুন টিকিট কাউন্টারটি অবিলম্বে চালু করার দাবিতে ১৪ জুলাই কাটোয়া স্টেশন ম্যানেজারের কাছে হাওড়া ডিভিশনের ডিআরএম-এর উদ্দেশ্যে লিখিত দাবিপত্র পেশ করা হয়। লাইন দুটিতে দীর্ঘ সাত মাস ধরে চলছে মাত্র এক জোড়া ট্রেন। এর বিরুদ্ধে 'কাটোয়া-বর্ধমান ও কাটোয়া-আমোদপুর রেলওয়ে যাত্রী কমিটি'র উদ্যোগে দুই শতাধিক মানুষ মিছিল করে স্টেশন ম্যানেজারের অফিসের সামনে সমবেত হন। ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন রবীন্দ্রনাথ পাল, সানি আজাদ, কিশোর দফাদার প্রমুখ রেলযাত্রী কমিটির নেতৃবৃন্দ। এক মাসের মধ্যে ট্রেন চালু না হলে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলার কথা ঘোষণা করা হয়।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই (সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com